আল্লাহর পথে দাওয়াত

মূল

ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর

আল্লাহর পথে দাওয়াত

ভূমিকা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

আল-হামদু লিল্লাহ। ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা রাসূলিল্লাহ। ওয়াআলা আলিহী ওয়া আসহাবিহী আজমাঈন।

আল্লাহর পথে আহবান করতেই নবী-রাসূলগণের পৃথিবীতে আগমন। মুমিনের জীবনের আন্যতম দায়িত্ব এই দাওয়াত। কোরআনুল কারিমে এ দায়িত্বকে কখনো দাওয়াত, কখনো সৎকার্যে আদেশ ও অসৎকার্যে নিষেধ, কখনো প্রচার, কখনো নসিহত ও কখনো দীন প্রতিষ্ঠা বলে অভিহিত করা হয়েছে। কোরআন ও হাদিসের আলোকে এ কাজের গুরুত্ব, এর বিধান, পুরস্কার, এ দায়িত্ব পালনে অবহেলার শাস্তি, ও কর্মে অংশগ্রহণের শর্তাবলী ও এর জন্য আবশ্যকীয় গুণাবলী আলোচনা করেছি এই পুস্তিকাটিতে। এ বিষয়ক কিছু ভুলভ্রান্তি, যেমন বিভিন্ন অজুহাতে এ দায়িত্বে অবহেলা, ফলাফলের ব্যস্ততা বা জাগতিক ফলাফল ভিত্তিক সফলতা বিচার, এ দায়িত্ব পালনে কঠোরতা ও উগ্রতা, আদেশ, নিষেধ বা দাওয়াত এবং বিচার ও শাস্তির মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়, আদেশ নিষেধ বা দাওয়াত এবং গীবত ও দোষ অনুসন্ধানের মধ্যে পার্থক্য ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করেছি। সবশেষে এ ইবাদত পালনের ক্ষেত্রে সুন্নাতে নববী এবং এ বিষয়ক কিছু ভুলভ্রান্তির কথা আলোচনা করেছি।

হাদিসের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র সহিহ বা নির্ভরযোগ্য হাদিসের উপর নির্ভর করার চেষ্টা করেছি। মুহাদ্দিসগণ অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও বৈজ্ঞানিক নিরীক্ষার মাধ্যমে হাদিসের বিশুদ্ধতা ও দুর্বলতা নির্ধারণ করেছেন, যে নিরীক্ষা-পদ্ধতি বিশ্বের যে কোনো বিচারালয়ের সাক্ষ্য-প্রমাণের নিরীক্ষার চেয়েও বেশি সূক্ষ্ম ও চুলচেরা। এর ভিত্তিতে যে সকল হাদিস সহিহ বা হাসান অর্থাৎ গ্রহণযোগ্য বলে প্রমাণিত হয়েছে আমি আমার আলোচনায় শুধুমাত্র সে হাদিসগুলিই উল্লেখ করার চেষ্টা করেছি।

অতি নগণ্য এ প্রচেষ্টাটুকু যদি কোনো আগ্রহী মুমিনকে উপকৃত করে তবে তা আমার বড় পাওয়া। কোনো সহৃদয় পাঠক দয়া করে পুস্তিকাটির বিষয়ে সমালোচনা, মতামত, সংশোধনী বা পরামর্শ প্রদান করলে তা লেখকের প্রতি তাঁর এহসান ও অনুগ্রহ বলে গণ্য হবে।

মহান আল্লাহর দরবারে সকাতরে প্রার্থনা করি, তিনি দয়া করে এ নগণ্য কর্মটুকু কবুল করে নিন এবং একে আমার, আমার পিতামাতা, স্ত্রী-সন্তান, আত্মীয়স্বজন ও পাঠকদের নাজাতের ওসিলা বানিয়ে দিন। আমীন!

প্রথম পরিচ্ছেদ : পরিচিতি, গুরুত্ব ও বিষয়বস্তু

নিজের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশনা বাস্তবায়নের পাশাপাশি নিজের আশেপাশে অবস্থানরত অন্যান্য মানুষদের মধ্যে আল্লাহর দীনকে বাস্তবায়নের চেষ্টা করা মুমিনের অন্যতম দায়িত্ব। এ জন্য মুমিনের জীবনের একটি বড় দায়িত্ব হলো - **আল আমরু বিল মারুফ অয়ান নাহ্ইউ আনিল মুনকার**- অর্থাৎ ন্যায় কাজের আদেশ ও অন্যায় থেকে নিষেধ করা। আদেশ ও নিষেধকে একত্রে **আদ-দাওয়াতু ইলাল্লাহ** বা আল্লাহর দিকে আহবান বলা হয়। এ ইবাদত পালনকারীকে দায়ী ইলাল্লাহ বা আল্লাহর দিকে আহবানকারী ও সংক্ষেপে দায়ী অর্থাৎ দাওয়াতকারী বা দাওয়াত-কর্মী বলা হয়। দাওয়াত (الدعوة) শব্দের অর্থ, আহবান করা বা ডাকা। আরবিতে (الأمر) বলতে আদেশ, নির্দেশ, উপদেশ, অনুরোধ, অনুনয় সবই বুঝায়। অনুরূপভাবে নাহই (النهي) বলতে নিষেধ, বর্জনের অনুরোধ ইত্যাদি বুঝানো হয়। কোরআন-হাদিসে এই দায়িত্ব বুঝানোর জন্য আরো অনেক পরিভাষা ব্যবহার করা হয়েছে: তন্মধ্যে রয়েছে আত-তাবলীগ (التبليغ) আন-নাসীহাহ (النصيحة) আল-ওয়াজ (الوعظ) ইত্যাদি। আত-তাবলীগ অর্থ পৌঁছানো, প্রচার করা, খবর দেওয়া, ঘোষণা দেওয়া বা জানিয়ে দেওয়া। আন-নাসীহাহ শব্দের অর্থ আন্তরিক ভালবাসা ও কল্যাণ কামনা। এ ভালবাসা ও কল্যাণ কামনা প্রসূত ওয়াজ, উপদেশ বা পরামর্শকেও নসিহত বলা হয়। ওয়াজ বাংলায় প্রচলিত অতি পরিচিত আরবি শব্দ। এর অর্থ উপদেশ, আবেদন, প্রচার, সতর্কীকরণ ইত্যাদি। দাওয়াতের এই দায়িত্ব পালনকে কোরআনুল কারিমে ইকামতে দীন বা দীন প্রতিষ্ঠা বলে অভিহিত করা হয়েছে। এগুলি সবই একই ইবাদতের বিভিন্ন নাম এবং একই ইবাদতের বিভিন্ন দিক। পরবর্তী আলোচনা থেকে আমরা তা বুঝতে পারব, ইনশাআল্লাহ।

কোরআন-হাদিসের আলোকে দাওয়াত-এর গুরুত্ব

নবী রাসূলগণের মূল দায়িত্ব: সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ, প্রচার, নসিহত, ওয়াজ বা এককথায় আল্লাহর দীন পালনের পথে আহবান করাই ছিল সকল নবী ও রাসূলের (আলাইহিমুস সালাম) দায়িত্ব। সকল নবীই তাঁর উম্মতকে তাওহিদ ও ইবাদতের আদেশ করেছেন এবং শিরক, কুফর ও পাপকাজ থেকে নিষেধ করেছেন।
মহান আল্লাহ বলেন:

❝ যারা অনুসরণ করে বার্তাবাহক উম্মি নবীর, যাঁর উল্লেখ তারা তাদের নিকট রক্ষিত তাওরাত ও ইনজীলে লিপিবদ্ধ পায়, যিনি তাদেরকে সৎকাজের নির্দেশ দেন এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করেন। (সূরা আরাফ: ১৫৭)

এ আয়াতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কর্মকে আদেশ ও নিষেধ নামে অভিহিত করা হয়েছে। অন্যত্র এ কর্মকে দাওয়াত বা আহবান নামে অভিহিত করা হয়েছে। আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা বলেন:

❝ তোমাদের কি হল যে, তোমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান আন না, অথচ রাসূল তোমাদেরকে আহবান করছেন যে, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আন। (সূরা হাদীদ: ৮)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এ দায়িত্বকে দাওয়াত বা আহবান বলে অভিহিত করে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন:

❝ আপনি আপনার প্রতিপালকের দিকে আহবান করুন হিকমত বা প্রজ্ঞা দ্বারা এবং সুন্দর ওয়াজ-উপদেশ দ্বারা এবং তাদের সাথে উৎকৃষ্টতর পদ্ধতিতে আলোচনা-বিতর্ক করুন। (সূরা নাহল: ১২৫)

অন্যত্র এই দায়িত্বকেই তাবলিগ বা প্রচার বলে অভিহিত করা হয়েছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন:

❝ হে রাসূল! আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আপনার উপর যা অবতীর্ণ হয়েছে তা আপনি প্রচার করুন। যদি আপনি তা না করেন তাহলে আপনি আল্লাহর বার্তা প্রচার করলেন না। (সূরা মায়েদা : ৬৭)

কোরআনুল কারিমে বারবার বলা হয়েছে যে, প্রচার বা পৌঁছানোই রাসূলগণের একমাত্র দায়িত্ব। নিচের আয়াতে বলা হয়েছে:

❝ রাসূলগণের দায়িত্ব তো কেবল সুস্পষ্টভাবে প্রচার করা। (সূরা নাহল: ৩৫)

নূহ আ.- এর জবানিতে বলা হয়েছে:

❝ আমি আমার প্রতিপলকের রিসালাতের দায়িত্ব তোমাদের কাছে পৌঁছে দিচ্ছি এবং আমি তোমাদের নসিহত করছি। (সূরা আরাফ: ৬২)

সূরা আরাফের ৬৮, ৭৯, ৯৩ নম্বর আয়াত, সূরা হুদ-এর ৩৪ নম্বর আয়াত ও অন্যান্য স্থানে
দাওয়াতকে নসিহত বলে অভিহিত করা হয়েছে
সূরা শুরার ১৩ আয়াতে বলেছেন:

❝ তিনি তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করেছেন দীন, যার নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি নূহকে- আর যা আমি ওহী করেছি আপনাকে- এবং যার নির্দেশ দিয়েছিলাম ইবরাহীম, মূসা এবং ঈসাকে, এ বলে যে, তোমরা দীন প্রতিষ্ঠা কর এবং তাতে দলাদলি-বিচ্ছিন্নতা করো না। আপনি মুশরিকদের যার প্রতি আহবান করছেন তা তাদের নিকট দুর্বহ মনে হয়। (সূরা শুরা: ১৩)

তাবারি, ইবনু কাসির ও অন্যান্য মুফাসসির, সাহাবি-তাবিয়ি মুফাসসিরগণ থেকে উদ্ধৃত করেছেন যে, দীন প্রতিষ্ঠার অর্থ হলো দীন পালন করা। আর দীন পরিপূর্ণ পালনের মধ্যেই রয়েছে আদেশ, নিষেধ ও দাওয়াত। এ অর্থে কোনো কোনো গবেষক দীন পালন বা নিজের জীবনে দীন প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি অন্যদের জীবনে দীন প্রতিষ্ঠার দাওয়াতকেও ইকামতে দীন বলে গণ্য করেছেন।

উম্মতে মুহাম্মদির অন্যতম দায়িত্ব ও বৈশিষ্ট্য

দাওয়াত, আদেশ-নিষেধ, দীন প্রতিষ্ঠা বা নসিহতের এই দায়িত্বই উম্মতে মুহাম্মদির অন্যতম দায়িত্ব ও বৈশিষ্ট্য।
ইরশাদ হয়েছে:

❝ আর যেন তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল হয়, যারা কল্যাণের প্রতি আহবান করবে, ভাল কাজের আদেশ দেবে এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করবে। আর তারাই সফলকাম। (সূরা আলে ইমরান: ১০৪)

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন:

❝ তোমরাই শ্রেষ্ঠ জাতি, মানবজাতির (কল্যাণের) জন্য তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে। তোমরা ন্যায়কার্যে আদেশ এবং অন্যায় কার্যে নিষেধ কর এবং আল্লাহতে বিশ্বাস কর। (সূরা আলে ইমরান: ১১০)

প্রকৃত মুমিনের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে আল্লাহ বলেন:

❝ তারা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে এবং তারা ভাল কাজের আদেশ দেয় ও মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করে। আর তারা কল্যাণকর কাজে দ্রুত ধাবিত হয় এবং তারা নেককারদের অন্তর্ভুক্ত। (সূরা আলে ইমরান: ১১৪)

আল্লাহ তাবারকা ওয়া তাআলা আরও বলেন:

❝ আর মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীরা একে অপরের বন্ধু, তারা ভাল কাজের আদেশ দেয় আর অন্যায় কাজ থেকে নিষেধ করে, আর তারা সালাত কায়েম করে, জাকাত প্রদান করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে। এদেরকে আল্লাহ শীঘ্রই দয়া করবেন, নিশ্চয় আল্লাহ পরক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (সূরা তাওবা: ৭১)

সূরা তাওবার ১১২ আয়াতে, সূরা হজ্জের ৪১ আয়াতে, সূরা লুকমানের ১৭ আয়াতে ও অন্যান্য স্থানেও উল্লেখ করা হয়েছে যে, আল্লাহর প্রকৃত মুমিন বান্দাদের অন্যতম বৈশিষ্ট হলো সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ।

এভাবে আমরা দেখছি যে, ঈমান, নামাজ, রোজা ইত্যাদি ইবাদতের মত সৎকাজের নির্দেশ ও অসৎকাজের নিষেধ মুমিনের অন্যতম কর্ম। শুধু তাই নয়, মুমিনদের পারস্পারিক বন্ধুত্বের দাবি হলো যে, তারা একে অপরের আন্যায় সমর্থন করেন না, বরং একে অপরকে ন্যায়কর্মে নির্দেশ দেন এবং অন্যায় থেকে নিষেধ করেন। এখানে আরো লক্ষণীয়, এ সকল আয়াতে ঈমান, নামাজ, জাকাত ইত্যাদির আগে সৎকার্যে আদেশ ও অসৎকার্যে নিষেধ করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এ থেকে আমরা মুমিনের জীবনে এর সবিশেষ গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারি।

এই দায়িত্বপালনকারী মুমিনকেই সর্বোত্তম বলে ঘোষণা করা হয়েছে পবিত্র কোরআনে। মহান আল্লাহ বলেন:

❝ ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা কথায় কে উত্তম যে আল্লাহর প্রতি মানুষকে আহবান করে, সৎকর্ম করে এবং বলে, আমি তো মুসলিমদের একজন। (সূরা ফুসসিলাত: ৩৩)

আমরা দেখেছি যে, আদেশ, নিষেধ বা দাওয়াত-এর আরেক নাম নসিহত। নসিহত বর্তমানে সাধারণভাবে উপদেশ অর্থে ব্যবহৃত হলেও মূল আরবিতে নসিহত অর্থ আন্তরিকতা ও কল্যাণ কামনা। কারো প্রতি আন্তিরকতা ও কল্যাণ কামনার বহি:প্রকাশ হলো তাকে ভাল কাজের পরামর্শ দেওয়া ও খারাপ কাজ থেকে নিষেধ করা। এ কাজটি মুমিনদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি অন্যতম দায়িত্ব। বরং এই কাজটির নামই দীন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

❝ দীন হলো নসিহত। সাহাবিগণ বললেন, কার জন্য ? বললেন, আল্লাহর জন্য, তাঁর কিতাবের জন্য, তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য, মুসলিমগণের নেতৃবর্গের জন্য এবং সাধারণ মুসলিমদের জন্য। (মুসলিম)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ নসিহতের জন্য সাহাবিগণের বাইআত তথা প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করতেন। বিভিন্ন হাদিসে জারির ইবনু আব্দুল্লাহ রা. মুগিরা ইবনু শুবা রা. প্রমুখ সাহাবি বলেন:

❝ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট বাইয়াত বা প্রতিজ্ঞা করেছি, সালাত কায়েম, জাকাত প্রদান ও প্রত্যেক মুসলিমের নসিহত (কল্যাণ কামনা) করার উপর। (বোখারি)।

এ অর্থে তিনি সৎকার্যে আদেশ ও অসৎকার্যে নিষেধের বাইয়াত গ্রহণ করতেন। উবাদাহ ইবনু সামিত ও অন্যান্য সাহাবি রা. বলেন:

❝ আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে বাইয়াত করি আনুগত্যের... এবং সৎকর্মে আদেশ ও অসৎকর্মে নিষেধের এবং এ কথার উপর যে, আমরা মহিমাময় আল্লাহর জন্য কথা বলব এবং সে বিষয়ে কোন নিন্দুকের নিন্দা বা গালি গালাজের তোয়াক্কা করব না। (আহমাদ, বিভিন্ন গ্রহণযোগ্য সনদে)।

ক্ষমতা বনাম দায়িত্ব এবং ফরজে আইন বনাম ফরজে কিফায়া

আদেশ নিষেধের জন্য স্বভাবতই ক্ষমতা ও যোগ্যতার প্রয়োজন। এ জন্য যারা সমাজে ও রাষ্ট্রে দায়িত্ব ও ক্ষমতায় রয়েছেন তাদের জন্য এ দায়িত্ব অধিকাংশ ক্ষেত্রে ফরজে আইন বা ব্যক্তিগতভাবে ফরজ। দায়িত্ব ও ক্ষমতা যত বেশি, আদেশ ও নিষেধের দায়িত্বও তত বেশি। আল্লাহর কাছে জবাবদিহিতার ভয়ও তাদের তত বেশি। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

যাদেরকে আমি পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা দান করলে বা ক্ষমতাবান করলে তারা সালাত কায়েম করে, জাকাত দেয়, সৎকার্যে নির্দেশ দেয় এবং অসৎকার্যে নিষেধ করে। আর সকল কর্মের পরিণাম আল্লাহর এখতিয়ারে। (সূরা হজ্জ : ৪১)

এ জন্য এ বিষয়ে শাসকগোষ্ঠী, প্রশাসনের সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গ, আঞ্চলিক প্রশাসকবর্গ, বিচারকবর্গ, আলিমগণ, বুদ্ধিজীবিবর্গ ও সমাজের অন্যান্য প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গের দায়িত্ব অন্যদের চেয়ে বেশি, তাদের জন্য আশংকাও বেশি। তাদের মধ্যে কেউ যদি দায়িত্ব পালন না করে নিশ্চুপ থাকেন তবে তার পরিণতি হবে কঠিন ও ভয়াবহ।
অনুরূপভাবে নিজের পরিবার, নিজের অধীনস্থ মানুষগণ ও নিজের প্রভাবাধীন মানুষদের আদেশ-নিষেধ করা গৃহকর্তা বা কর্মকর্তার জন্য ফরজে আইন। কারণ আল্লাহ তাকে এদের উপর ক্ষমতাবান ও দায়িত্বশীল করেছেন এবং তিনি তাকে এদের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করবেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

❝ সাবধান! তোমরা সকলেই অভিভাবকত্বের দায়িত্বপ্রাপ্ত এবং প্রত্যেকেই তার দায়িত্বাধীনদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। মানুষদের উপর দায়িত্বপ্রাপ্ত শাসক বা প্রশাসক, অভিভাবক এবং তাকে তার অধীনস্ত জনগণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। বাড়ির কর্তাব্যক্তি তার পরিবারের সদস্যদের

দায়িত্বপ্রাপ্ত অভিভাবক এবং তাকে তাদের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হবে। স্ত্রী তার স্বামীর বাড়ি ও তার সন্তান-সন্ততির দায়িত্বপ্রাপ্তা এবং তাকে তাদের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হবে। (বোখারি ও মুসলিম)।

কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, অন্যায় ও অসৎকর্মের প্রতিবাদ করা শুধুমাত্র এদেরই দায়িত্ব। বরং তা সকল মুসলমানের দায়িত্ব। যিনি অন্যায় বা গর্হিত কর্ম দেখবেন তার উপরেই দায়িত্ব হয়ে যাবে সাধ্য ও সুযোগমত তার সংশোধন বা প্রতিকার করা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

❝ তোমাদের কেউ যদি কোনো অন্যায় দেখতে পায় তবে সে তাকে তার বাহুবল দিয়ে প্রতিহত করবে। যদি তাতে সক্ষম না হয় তবে সে তার বক্তব্যের মাধ্যমে (প্রতিবাদ) তা পরিবর্তন করবে। এতেও যদি সক্ষম না হয় তা হলে অন্তর দিয়ে তার পরিবর্তন (কামনা) করবে। আর এটা হলো ঈমানের দুর্বলতম পর্যায়। (মুসলিম)।

এ থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, প্রত্যেক মুমিনেরই দায়িত্ব হলো, অন্যায় দেখতে পেলে সাধ্য ও সুযোগ মত তার পরিবর্তন বা সংশোধন করা। এক্ষেত্রে অন্যায়কে অন্তর থেকে ঘৃণা করা এবং এর অবসান ও প্রতিকার কামনা করা প্রত্যেক মুমিনের উপরেই ফরজ। অন্যায়ের প্রতি হৃদয়ের বিরক্তি ও ঘৃণা না থাকা ঈমান হারানোর লক্ষণ। আমরা অগণিত পাপ, কুফর, হারাম ও নিষিদ্ধ কর্মের সয়লাবের মধ্যে বাস করি। বারংবার দেখতে দেখতে আমাদের মনের বিরক্তি ও আপত্তি কমে যায়। তখন মনে হতে থাকে, এ তো স্বাভাবিক বা এ তো হতেই পারে। পাপকে অন্তর থেকে মেনে নেওয়ার এ অবস্থাই হলো ঈমান হারানোর অবস্থা। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা নিষেধ করেছেন বা যা পাপ ও অন্যায় তাকে ঘৃণা করতে হবে, যদিও তা আমার নিজের দ্বারা সংঘটিত হয় বা বিশ্বের সকল মানুষ তা করেন। এ হলো ঈমানের নূন্যতম দাবী।

উপরের আয়াত ও হাদিস থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে ক্ষমতার ভিত্তিতে এই ইবাদতটির দায়িত্ব বর্তাবে। এ জন্য ফকীহগণ উল্লেখ করেছেন যে, দীন প্রতিষ্ঠা বা দাওয়াত ও আদেশ নিষেধের এ ইবাদতটি সাধারণভাবে ফরজে কিফায়া।

যদি সমাজের একাধিক মানুষ কোনো অন্যায় বা শরিয়ত বিরোধী কর্মের কথা জানতে পারেন বা দেখতে পান তাহলে তার প্রতিবাদ বা প্রতিকার করা তাদের সকলের উপর সামষ্টিকভাবে ফরজ বা ফরজে কিফায়া। তাদের মধ্য থেকে কোনো একজন যদি এ দায়িত্ব পালন করেন তবে তিনি ইবাদতটি পালনের সাওয়াব পাবেন এবং বাকিদের জন্য তা মূলত: নফল ইবাদতে পরিণত হবে। বাকি মানুষেরা তা পালন করলে সাওয়াব পাবেন, তবে পালন না করলে গোনাহগার হবেন না। আর যদি কেউই তা পালন না করেন তাহলে সকলেই পাপী হবেন।

দুইটি কারণে তা ফরজে আইন বা ব্যক্তিগত ফরজে পরিণত হয়:

- প্রথমত: ক্ষমতা। যদি কেউ জানতে পারেন যে, তিনিই এ অন্যায়টির প্রতিকার করার ক্ষমতা রাখেন তাহলে তার জন্য তা ফরজে আইন-এ পরিণত হয়। পরিবারের অভিভাবক, এলাকার বা দেশের রাজনৈতিক বা প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও নেতৃবৃন্দের জন্য এ দায়িত্বটি এ পর্যায়ে ফরজে আইন। এ ছাড়া যে কোনো পরিস্থিতিতে যদি কেউ বুঝতে পারেন যে, তিনি হস্তক্ষেপ করলে বা কথা বললে অন্যায়টি বন্ধ হবে বা ন্যায়টি প্রতিষ্ঠিত হবে তবে তা তার জন্য ফরজে আইন বা ব্যক্তিগতভাবে ফরজ হবে।
- দ্বিতীয়ত: দেখা। যদি কেউ জানতে পারেন যে, তিনি ছাড়া অন্য কেউ অন্যায়টি দেখেনি বা জানেনি, তবে তার জন্য তা নিষেধ করা ও পরিত্যাগের জন্য দাওয়াত দেওয়া ফরজে আইন বা ব্যক্তিগত ফরজ এ-পরিণত হয়। সর্বাবস্থায় এ প্রতিবাদ, প্রতিকার ও দাওয়াত হবে সাধ্যানুযায়ী হাত দিয়ে মুখ দিয়ে বা অন্তর দিয়ে।

আল্লাহর পথে দাওয়াত-এর বিষয়বস্তু দাওয়াত, আদেশ, নিষেধ, ওয়াজ, নসিহত ইত্যাদির বিষয়বস্তু কী? আমরা কোন কোন বিষয়ের দাওয়াত বা আদেশ-নিষেধ করব? কোন বিষয়ের কতটুকু গুরুত্ব দিতে হবে? আমরা কি শুধুমাত্র নামাজ রোজা ইত্যাদি ইবাদতের জন্য দাওয়াত প্রদান করব? নাকি চিকিৎসা, ব্যবসা, শিক্ষা, সমাজ, মানবাধিকার, সততা ইত্যাদি বিষয়েও দাওয়াত প্রদান করব? আমরা কি শুধু মানুষদের জন্যই দাওয়াত প্রদান করব? নাকি আমরা জীব-জানোয়ার, প্রকৃতি ও পরিবেশের কল্যাণেও দাওয়াত ও আদেশ-নিষেধ করব?

ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। ঈমান, বিশ্বাস, ইবাদত, মুআমালাত ইত্যাদি সকল বিষয়ের প্রতিটি ক্ষেত্রে এর বিস্তারিত নির্দেশনা রয়েছে। সকল বিষয়ই দাওয়াতের বিষয়। কিছু বিষয় বাদ দিয়ে শুধুমাত্র কিছু বিষয়ের মধ্যে দাওয়াতকে সীমাবদ্ধ করার অধিকার মুমিনকে দেওয়া হয়নি। তবে গুরুত্বগত পার্থক্য রয়েছে। দাওয়াতের সংবিধান কোরআনুল কারিম ও হাদিস শরিফে যে বিষয়গুলির প্রতি দাওয়াতের বেশি গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে, মুমিনও সেগুলির প্রতি বেশি গুরুত্ব প্রদান করবেন।

আমরা জানি যে, কোরআন ও হাদিসে প্রদত্ত গুরুত্ব অনুসারে মুমিন জীবনের কর্মগুলিকে বিভিন্ন পর্যায়ে ভাগ করা হয়েছে। ফরজে আইন, ফরজে কিফায়া, ওয়াজিব, সুন্নাত, মুসতাহাব, হারাম, মাকরূহ, মুবাহ ইত্যাদি পরিভাষাগুলি আমাদের নিকট পরিচিত। কিন্তু অনেক সময় আমরা ফজিলতের কথা বলতে যেয়ে আবেগ বা অজ্ঞতা বসত এক্ষেত্রে মারাত্মক ভুল করে থাকি। নফল-মুসতাহাব কর্মের দাওয়াত দিতে যেয়ে ফরজ, ওয়াজেব কর্মের কথা ভুলে যাই বা অবহেলা করি। এছাড়া অনেক সময় মুসতাহাবের ফজিলত বলতে যেয়ে হারামের ভয়ঙ্কর পরিণতির কথা বলা হয় না।

কোরআন-হাদিসের দাওয়াত পদ্ধতি থেকে আমরা দাওয়াত ও দীন প্রতিষ্ঠার আদেশ নিষেধের বিষয়াবলীর গুরুত্বের পর্যায় নিম্নরূপ দেখতে পাই।

- **প্রথমত: তাওহিদ ও রিসালাতের বিশুদ্ধ ঈমান অর্জন ও সর্ব প্রকার শিরক, কুফর ও নিফাক থেকে আত্মরক্ষা** সকল নবীরই দাওয়াতের বিষয় ছিল প্রথমত: এটি। কোরআন-হাদিসে এ বিষয়ের দাওয়াতই সবচেয়ে বেশি দেওয়া হয়েছে। একদিকে যেমন তাওহিদের বিধানাবলী বিস্তারিত বর্ণনা করে তাওহিদ প্রতিষ্ঠার দাওয়াত দেওয়া হয়েছে, তেমনি বারংবার শিরক, কুফর ও নিফাকের বিস্তারিত বর্ণনা দিয়ে তা থেকে নিষেধ করা হয়েছে।বর্তমান সময়ে দীনের পথে দাওয়াতে ব্যস্ত অধিকাংশ দায়ী এই বিষয়টিতে ভয়ানকভাবে অবহেলা করেন। আমরা চিন্তা করি যে, আমরা তো মুমিনদেরকেই দাওয়াত দিচ্ছি। কাজেই ঈমান-আকিদা বা তাওহিদের বিষয়ে দাওয়াত দেওয়ার বা শিরক-কুফর থেকে নিষেধ করার কোন প্রয়োজনীয়তা নেই। অথচ মহান আল্লাহ বলেন:

  > তাদের অধিকাংশ আল্লাহর উপর ঈমান আনায়ন করে, তবে (ইবাদতে) শিরক করা অবস্থায়। (সূরা ইউসুফ: ১০৬)

  হাদিস শরিফে মুমিনদেরকে বারংবার শিরক কুফর থেকে সাবধান করা হয়েছে। শিরক, কুফর ও নিফাক মুক্ত বিশুদ্ধ তাওহিদ ও রিসালাতের ঈমান ছাড়া নামাজ, রোজা, দাওয়াত, জিহাদ, জিকর, তাযকিয়া ইত্যাদি সকল ফরজ বা নফল ইবাদতই অর্থহীন।

- **দ্বিতীয়ত: বান্দার বা সৃষ্টির অধিকার সংশ্লিষ্ট হারাম বর্জন**আমরা জানি ফরজকর্ম দুই প্রকার, করণীয় ফরজ ও বর্জনীয় ফরজ। যা বর্জন করা ফরজ তাকে হারাম বলা হয়। হারাম দুই প্রকার, প্রথম প্রকার হারাম, মানুষ ও সৃষ্টির অধিকার নষ্ট করা বা তাদের কোনো ক্ষতি করা বিষয়ক হারাম। এগুলি বর্জন করা সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ।পিতামাতা, স্ত্রী, সন্তান, অধীনস্ত, সহকর্মী, প্রতিবেশী, দরিদ্র, এতিম ও অন্যান্য সকলের অধিকার সঠিকভাবে আদায় করা, কোনোভাবে কারো অধিকার নষ্ট না করা, কাউকে জুলুম না করা, গীবত না করা, ওজন-পরিমাপ ইত্যাদিতে কম না করা, প্রতিজ্ঞা, চুক্তি, দায়িত্ব বা আমানত আদায়ে আবহেলা না করা, হারাম উপার্জন থেকে আত্মরক্ষা করা, নিজের বা আত্মীয়দের বিরুদ্ধে হলেও ন্যয় কথা বলা ও ন্যয় বিচার করা, কাফির শত্রুদের পক্ষে হলেও ন্যয়ানুগ পন্থায় বিচার-ফয়সালা করা ইত্যাদি বিষয় কোরআন ও হাদিসের দাওয়াত ও আদেশ নিষেধের অন্যতম গুরিত্বপূর্ণ বিষয়।এমনকি রাস্তাঘাট, মজলিস, সমাজ বা পরিবেশে কাউকে কষ্ট দেওয়া এবং কারো অসুবিধা সৃষ্টি করাকেও হাদিস শরিফে কঠিনভাবে নিষেধ করা হয়েছে। সৃষ্টির অধিকার বলতে শুধু মানুষদের অধিকারই বুঝানো হয়নি। পশুপাখির অধিকার সংরক্ষণ, মানুষের

প্রয়োজন ছাড়া কোনো প্রাণীকে কষ্ট না দেওয়া ইত্যাদি বিষয়ে অত্যন্ত কঠোরভাবে সতর্ক করা হয়েছে। দাওয়াতের ক্ষেত্রে অনেক সময় এ বিষয়গুলি অবহেলিত। এমনকি অনেক দায়ী বা দাওয়াতকর্মীও এ সকল অপরাধে জড়িত হয়ে পড়েন। যেকোনো কর্মস্থলে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীর জন্য কর্মস্থলের দায়িত্ব পরিপূর্ণ আন্তরিকতার সাথে সঠিকভাবে পালন করা ফরজে আইন। যদি কেউ নিজের কর্মস্থলে ফরজ সেবা গ্রহণের জন্য আগত ব্যক্তিকে ফরজ সেবা প্রদান না করে তাকে পরদিন আসতে বলেন বা একঘন্টা বসিয়ে রেখে চাশতের নামাজ আদায় করেন বা দাওয়াতে অংশ গ্রহণ করেন তাহলে তিনি মূলত: ঐ ব্যক্তির মত কর্ম করছেন, যে ব্যক্তি পাগড়ির ফজিলতের কথায় মোহিত হয়ে লুঙ্গি খুলে উলঙ্গ হয়ে পাগড়ি পরেছেন।অধিকার ও দায়িত্ব বিষয়ক আদেশ-নিষেধ কোরআন হাদিসে বেশি থাকলেও আমরা এ সকল বিষয়ে বেশি আগ্রহী নই। কর্মকর্তা, কর্মচারী, শিক্ষক, ডাক্তার, নার্স ও অন্যান্যদেরকে কর্মস্থলে দায়িত্ব পালন ও আন্তরিকতার সাথে সেবা প্রদানের বিষয়ে দাওয়াত ও আদেশ নিষেধ করতে আমরা আগ্রহী নই। অবৈধ পার্কিং করে, রাস্তার উপর বাজার বসিয়ে, রাস্তা বন্ধ করে মিটিং করে বা অনুরূপ কোনোভাবে মানুষের কষ্ট দেওয়া, অপ্রয়োজনীয় ধোঁয়া, গ্যাস, শব্দ ইত্যাদির মাধ্যমে মানুষের বা জীব জানোয়ারের কষ্ট দেওয়া বা প্রাকৃতিক পরিবেশ নষ্ট করা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা, দাওয়াত বা আদেশ-নিষেধ করাকে আমরা অনেকেই আল্লাহর পথে দাওয়াতের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে মনে করি না। বরং এগুলিকে জাগতিক, দুনিয়াবী বা আধুনিক বলে মনে করি।

- **তৃতীয়ত: পরিবার ও অধীনস্তদেরকে ইসলাম অনুসারে পরিচালিত করা**বান্দার হক, বা মানবাধিকার বিষয়ক দায়িত্ব সমূহের অন্যতম হলো নিজের দায়িত্বাধীনদেরকে দীনের দাওয়াত দেওয়া ও দীনের পথে পরিচালিত করা। দাওয়াতকর্মী বা দায়ী নিজে যেমন এ বিষয়ে সতর্ক হবেন, তেমনি বিষয়টি দাওয়াতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে গ্রহণ করবেন।
- **চতুর্থত: অন্যান্য হারাম বর্জন করা**হত্যা, মদপান, রক্তপান, শুকরের মাংস ভক্ষণ, ব্যভিচার, মিথ্যা, জুয়া, হিংসা-বিদ্বেষ, অহংকার, রিয়া ইত্যাদিও হারাম। দায়ী বা দাওয়াতকর্মী নিজে এ সব থেকে নিজের কর্ম ও হৃদয়কে পবিত্র করবেন এবং এগুলি থেকে পবিত্র হওয়ার জন্য দাওয়াত প্রদান করবেন। আমরা দেখতে পাই যে, কুরাআন ও হাদিসে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বারংবার বিভিন্নভাবে এবিষয়ক দাওয়াত প্রদান করা হয়েছে।
- **পঞ্চমত: পালনীয় ফরজ-ওয়াজিবগুলি আদায় করা**নামাজ, জাকাত, রোজা, হজ্জ, হালাল উপার্জন, ফরজে আইন পর্যায়ের ইলম শিক্ষা ইত্যাদি এ জাতীয় ফরজ ইবাদত এবং দাওয়াতের অন্যতম বিষয়।
- **ষষ্ঠত: সৃষ্টির উপকার ও কল্যাণমূলক সুন্নাত-নফল ইবাদত করা**সকল সৃষ্টিকে তার অধিকার বুঝে দেওয়া ফরজ। অধিকারের অতিরিক্ত সকলকে যথাসাধ্য সাহায্য ও উপকার করা কোরআন হাদিসের আলোকে সর্বশ্রেষ্ঠ নফল ইবাদত এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের সবচেয়ে

সহজ ও প্রিয়তম পথ। ক্ষুধার্তকে আহার দেওয়া, দরিদ্রকে দারিদ্রমুক্ত করা, বিপদগ্রস্থকে বিপদ হতে মুক্ত হতে সাহায্য করা, অসুস্থকে দেখতে যাওয়া, চিকিৎসার ব্যবস্থা করা এবং যে কোনোভাবে যে কোনো মানুষের বা সৃষ্টির কল্যাণ, সেবা বা উপকারে সামান্যতম কর্ম আল্লাহর নিকট অত্যন্ত প্রিয়। কোরআন ও হাদিসে এ সকল বিষয়ে বারংবার দাওয়াত ও আদেশ নিষেধ করা হয়েছে।

- **সপ্তমত: আল্লাহ ও তাঁর বান্দার মধ্যকার সুন্নত-নফল ইবাদত করা**নফল নামাজ, রোজা, যিকির, তিলাওয়াত, ফরজে কিফায়া বা নফল পর্যায়ের দাওয়াত, তাবলিগ, জিহাদ, নসিহত, তাযকিয়া ইত্যাদি এ পর্যায়ের। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দাওয়াতে রত মুমিনগণ ষষ্ঠ পর্যায়ের নফল ইবাদতের চেয়ে সপ্তম পর্যায়ের নফল ইবাদতের দাওয়াত বেশি প্রদান করেন। বিশেষত, দারিদ্র বিমোচন, কর্মসংস্থান তৈরি, হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা, চিকিৎসা সেবা প্রদান ইত্যাদি বিষয়ের দাওয়াত প্রদানকে আমরা আল্লাহর পথে দাওয়াত বলে মনেই করি না। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, মানুষ ছাড়া অন্য কোনো জীব-জানোয়ারও যদি কোনো অন্যায় বা ক্ষতির কর্মে লিপ্ত থাকে সাধ্য ও সুযোগমত তার প্রতিকার করাও আদেশ নিষেধ ও কল্যাণ কামনার অংশ। যেমন কারো পশু বিপদে পড়তে যাচ্ছে বা কারো ফসল নষ্ট করছে দেখতে পেলে মুমিনের দায়িত্ব হল সুযোগ ও সাধ্যমত তার প্রতিকার করা। তিনি এই কর্মের জন্য আদেশ-নিষেধ ও নসিহতের সাওয়াব লাভ করবেন। পূর্ববর্তী যুগের প্রাজ্ঞ আলেমগণ এ সকল বিষয় বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। কিন্তু বর্তমান সময়ে অনেকেই এ সকল বিষয়কে আল্লাহর পথে দাওয়াত বা দীন প্রতিষ্ঠার অংশ বলে বুঝতে পারেন না। মহান আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর সন্তুষ্টির পথে পরিচালিত করুন।

পুরস্কার ও শাস্তি

দাওয়াতের ফজিলত ও সাওয়াব

সাধারণ সাওয়াব ও বিশেষ সাওয়াব

আমরা আল্লাহর পথে দাওয়াত : ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর -১ পোস্টে উল্লেখিত আয়াত ও হাদিস থেকে সৎকার্যে আদেশ ও অসৎকার্যে নিষেধ, দাওয়াত, দীন প্রচার বা দীন প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব বুঝতে পেরেছি। আমরা দেখেছি, কাজটি মুমিনের জন্য একটি বড় ইবাদত। এ ইবাদত পালন করলে মুমিন নামাজ, রোজা ও অন্যান্য ইবাদত পালনের ন্যায় সাওয়াব ও পুরস্কার লাভ করবেন। অবহেলা করলে অনুরূপ ইবাদতে অবহেলার শাস্তি তার প্রাপ্য হবে। তবে এক্ষেত্রে লক্ষনীয় যে, কোরআন হাদিসে দাওয়াত বা আদেশ নিষেধের এই ইবাদতের জন্য অতিরিক্ত পুরস্কার ও শাস্তির কথা জানানো হয়েছে। পুরস্কারের ক্ষেত্রে তিনটি বিষয় লক্ষনীয়: ১. সর্বোচ্চ পুরস্কার, ২. অন্যান্য অনেক মানুষের কর্মের সমপরিমাণ সাওয়াব ও ৩. জাগতিক গজব ও শাস্তি থেকে রক্ষা পাওয়া।

সফলতা ও সর্বোচ্চ পুরস্কার

আমরা দেখেছি যে, দাওয়াত ও আদেশ নিষেধের দায়িত্ব পালনকারীরাই সফলকাম বলে কোরআনে সূরা আলে ইমরানের ১০৪ আয়াতে বলা হয়েছে । সূরা নিসার ১১৪ আয়াতে বলা হয়েছে যে, এই দায়িত্ব পালনকারীর জন্য রয়েছে মহা উত্তম পুরস্কার:

❝ তাদের গোপন পরামর্শের অধিকাংশে কোনো কল্যাণ নেই। তবে (কল্যাণ আছে) যে নির্দেশ দেয় সদকা কিংবা ভালো কাজ অথবা মানুষের মধ্যে মীমাংসার। আর যে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে করবে তবে অচিরেই আমি তাকে মহাপুরস্কার দান করব। (সূরা নিসা: ১১৪)

দায়ীর সর্বোচ্চ পুরস্কার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

❝ আল্লাহর কসম, তোমার মাধ্যমে যদি একজন মানুষকেও আল্লাহ সুপথ দেখান তাহলে তা তোমার জন্য (সর্বোচ্চ সম্পদ) লাল উটের মালিক হওয়ার চেয়েও উত্তম বলে গণ্য হবে। (বোখারি ও মুসলিম)।

অন্য হাদিসে তিনি বলেছেন:

❝ ভাল কার্যে নির্দেশ করা সদকা বলে গণ্য এবং খারাপ থেকে নিষেধ করা সদকা বলে গণ্য। (মুসলিম)।

আমরা যারা সহজে মুখ খুলতে চাই না তাদের একটু চিন্তা করা দরকার। প্রতিদিন অগণিতবার আমরা সুযোগ পাই মুখ দিয়ে মানুষকে একটি ভাল কথা বলার। লোকটি কথা শুনবে কি-না তা বিবেচ্য বিষয়ই নয়। আমি শুধু বলার সুযোগটা ব্যবহার করে সাওয়াব অর্জন করতে পারলেইতো হল। একটু ভালবেসে একটি ভাল উপদেশমূলক কথা আমার জন্য আল্লাহর দরবারে অগণিত পুরস্কার জমা করবে। সাথে সাথে লোকটিরও উপকার হতে পারে। যদি হয়, তবে আমরা দ্বিতীয় পর্যায়ের বিশেষ পুরস্কার লাভ করব।

অগণিত মানুষের সমপরিমাণ সাওয়াব

দায়ী, মুবাল্লিগ বা দাওয়াত ও তাবলিগে রত ব্যক্তির বিশেষ পুরস্কারের দ্বিতীয় দিক হলো তার এই কর্মের ফলে যত মানুষ ভাল পথে আসবেন সকলের সাওয়াবের সমপরিমাণ সাওয়াব তিনি একা লাভ করবেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

❝ যদি কোনো ব্যক্তি কোনো ভাল পথে আহবান করে, তবে যত মানুষ তার অনুসরণ করবে তাদের সকলের পুরস্কারের সমপরিমাণ পুরস্কার সে ব্যক্তি লাভ করবে, তবে এতে অনুসরণকারীদের পুরস্কারের কোনো ঘাটতি হবে না। আর যদি কোনো ব্যক্তি কোনো বিভ্রান্তির দিকে আহবান করে তবে যত মানুষ তার অনুসরণ করবে তাদের সকলের পাপের সমপরিমাণ পাপ সে ব্যক্তি লাভ করবে, তবে এতে অনুসরণকারীদের পাপের কোনো ঘাটতি হবে না। (মুসলিম)।

মুমিন যদি কোনো একটি ভাল কর্ম করতে সক্ষম নাও হন, কিন্তু তাঁর নির্দেশনা-পরামর্শে কেউ তা করে, তবে তিনি কর্ম সম্পাদনকারীর সমপরিমাণ সাওয়াব পান। এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন:

❝ যদি কেউ কোনো ভাল কর্মের দিকে নির্দেশনা প্রদান করে তবে তিনি কর্মটি পালনকারীর সমপরিমাণ সাওয়াব লাভ করবেন। (মুসলিম)।

আজাব গজব থেকে রক্ষা

দাওয়াত ও আদেশ নিষেধের দায়িত্ব পলন করার অন্যতম পুরস্কার হলো জাগতিক গজব থেকে রক্ষা পাওয়া। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি সুন্দর উদাহরণের মাধ্যমে তা বুঝিয়েছেন। তিনি বলেন:

❝ যে ব্যক্তি আল্লাহর বিধিবিধান সংরক্ষণের জন্য সচেষ্ট এবং যে লঙ্ঘন করছে উভয়ের উদাহরণ হলো একদল মানুষের মত। তারা সমুদ্রে একটি জাহাজ বা বজরা ভাড়া করে। লটারির মাধ্যমে কেউ উপরে এবং কেউ নিচের তলায় স্থান পায়। যারা নিচে অবস্থান গ্রহণ করল তাদের পানির জন্য উপরে আসতে হয়। এতে উপরের মানুষদের গায়ে পানি পড়তে লাগল। তখন উপরের মানুষেরা বলল, আমাদেরকে এভাবে কষ্ট দিয়ে তোমাদেরকে উপরে উঠতে দিব না। তখন নিচের মানুষেরা বলল, আমরা আমাদের অংশে বা জাহাজের নিচে একটি গর্ত করি, তাহলে আমরা সহজে পানি নিতে পারব এবং উপরের মানুষদের কষ্ট দিতে হবে না। এই অবস্থায় যদি উপরের মানুষেরা তাদের এ কাজে বাধা দেয় এবং নিষেধ করে তাহলে তারা সকলেই বেঁচে যাবে। আর যদি তারা তাদেরকে এ কাজ করতে সুযোগ দেয় তাহল তারা সকলেই ডুবে মরবে। (বোখারি, তিরমিজি)।

নবুওয়তের নূর থেকে উৎসারিত এ উদাহরণটি ভাল করে চিন্তা করুন। সমাজের অনেক ক্ষমতাধর বা প্রভাবশালী মানুষ অনেক প্রকারের অন্যায় বা গর্হিত কাজ দেখেও প্রতিবাদ করেন না। তাঁরা জানেন যে, তাঁরা প্রতিবাদ করলে তা বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু তারা নিরবতা বা তাৎক্ষণিক সুবিধাকে অগ্রাধিকার দেন। তারা ভাবেন, এতে আমার তো কোনো ক্ষতি হচ্ছে না। কষ্ট করছে অন্য মানুষেরা। নষ্ট হচ্ছে অন্য মানুষের সন্তানেরা। তাদের বুঝা উচিত যে, সমাজের এ অবক্ষয় কোনো না কোনো ভাবে তাদের ও তাদের ভবিষ্যত প্রজন্মকে স্পর্শ করবেই। এ জন্য আমাদের সকলকেই আদেশ-নিষেধের এ দায়িত্ব পালনে সজাগ থাকতে হবে।

সাধারণ শাস্তি বনাম বিশেষ শাস্তি

পূর্বের আলোচনা থেকে আমরা জেনেছি যে, ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধ বা এককথায় আল্লাহর পথে দাওয়াত একটি ফরজে আইন বা ফরজে কিফায়া ইবাদত। সাধারণভাবে আমরা বুঝতে পারি যে, এ ইবাদত পালনে অবহেলা করলে এ জাতীয় অন্যান্য ইবাদত পালনে অবহেলার ন্যায় গোনাহ হবে। তবে কোরআন হাদিসের বর্ণনা থেকে আমরা দেখতে পাই যে, এ ইবাদত পালনে

অবহেলা করার জন্য, বিশেষত, অন্যায় কাজ দেখে সাধ্যমত তার আপত্তি ও সংশোধন না করার জন্য বিশেষ ও কঠিন শাস্তি রয়েছে। শাস্তিগুলি নিম্নরূপ:

- **দুনিয়াবী গজব**
  কোরআন ও হাদিসের নির্দেশনা থেকে আমরা জানতে পারি যে, যুগে যুগে যারা তাঁদের সমাজের মানুষদেরকে অন্যায় পরিত্যাগ করতে আহবান করেছেন, এসব দায়ী ও মুবাল্লিগকে আল্লাহ গজব ও শাস্তি থেকে রক্ষা করেছেন। আর পাপীরা ও পাপের নিরব সমর্থক পুণ্যবানরা শাস্তির মধ্যে নিপতিত হয়েছেন। ইহুদিদের জন্য শনিবারে কোনোরূপ কর্ম করা নিষেধ ছিল। শনিবার কোনো জেলে মৎস শিকার করত না। এজন্য নদীতে প্রচুর মাছ দেখা যেত। তাদের মধ্যকার একদল মানুষ হিলা বাহানা করে শনিবারে জাল ফেলে রাখতে শুরু করল, যেন রবিবারে মাছ ধরতে পারে। তখন ভাল মানুষের একদল তাদের নিষেধ করেন আর একদল বলেন, এসব মানুষের ধ্বংস অনিবার্য, এদের নিষেধ করে কি লাভ। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন:

  > “ আর স্মরণ কর, যখন তাদের একদল বলল, তোমরা কেন উপদেশ দিচ্ছ এমন কওমকে, যাদেরকে আল্লাহ ধ্বংস করবেন অথবা কঠিন আজাব দেবেন ? তারা বলল, তোমাদের রবের নিকট ওজর পেশ করার উদ্দেশ্যে। আর হয়তো তারা তাকওয়া অবলম্বন করবে। অত:পর যে উপদেশ তাদেরকে দেয়া হয়েছিল, যখন তারা তা ভুলে গেল তখন আমি মুক্তি দিলাম তাদেরকে যারা মন্দ হতে নিষেধ করে। আর যারা জুলুম করেছে তাদেরকে কঠিন আজাব দ্বারা পাকড়াও করলাম। কারণ তারা পাপাচার করত। (সূরা আরাফ : ১৬৪-১৬৫)

  এখানে আমরা দেখছি যে, যারা অন্যায় থেকে নিষেধ করেছেন শুধু তাদেরকেই আল্লাহ গজব-শাস্তি থেকে রক্ষা করেছেন।
  সূরা মায়িদার ৭৮-৭৯ আয়াতে ও সূরা হূদ-এর ১১৬ আয়াতেও অনুরূপ কথা বলা হয়েছে। উপরের আয়াত থেকে আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারছি যে, ওকে বললে কোনো লাভ হবে না, এরূপ ধারণা করে সৎকার্যে আদেশ ও অসৎকার্যে নিষেধ থেকে বিরত থাকা জায়েয নয়। কারণ,

  - প্রথমত: লোকটি কথা শুনবে না একথা নিশ্চিত জানলেও আমাকে বলতে হবে, আমার দায়িত্ব হলো বলা, আমাকে আমার দায়িত্ব পালন করতেই হবে।
  - দ্বিতীয়ত: লোকটি কথা শুনবে না, একথা এভাবে নিশ্চিত ধারণা করাও ঠিক নয়। কারণ, হয়ত আন্তরিকতাপূর্ণ ভাল কথাটি তার মনে প্রভাব ফেলতে পারে। দাওয়াতে অবহেলার জাগতিক শাস্তির বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

> ❝ যখন মানুষেরা অন্যায় দেখেও তা পরিবর্তন বা সংশোধন করবে না তখন যে কোন মুহূর্তে আল্লাহর শাস্তি তাদের সবাইকে গ্রাস করবে। (তিরমিজি, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, মুসনাদে আহমাদ। সনদ সহিহ)
>
> অন্য হাদিসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন:
>
> > ❝ কোনো সমাজের মধ্যে যদি কোনো ব্যক্তি অবস্থান করে সেখানে অন্যায় পাপে লিপ্ত থাকে এবং সে সমাজের মানুষেরা তার সংশোধন-পরিবর্তন করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তা না করে, তবে তাদের মৃত্যুর পূর্বেই আল্লাহর আজাব তাদেরকে গ্রাস করবে। (আবু দাউদ, হাদিসটি হাসান)।

- **দোয়া কবুল না হওয়া**
  রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

  > ❝ যার হাতে আমার জীবন, তাঁর শপথ! তোমরা অবশ্যই কল্যাণের আদেশ করবে এবং মন্দ থেকে নিষেধ করবে, তা না হলে আল্লাহ অচিরেই তোমাদের সবার উপর তাঁর গজব ও শাস্তি পাঠাবেন, তারপর তোমরা আল্লাহকে ডাকবে, কিন্তু তোমাদের ডাকে সাড়া দেওয়া হবে না বা তোমাদের দোয়া কবুল করা হবে না। (তিরমিজি, হাসান সূত্রে)

- **সামাজিক শান্তি, ঐক্য ও সম্প্রীতি নষ্ট হওয়া**
  অন্য হাদিসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: ইসরাঈল সন্তানদের (ইহুদি জাতির) মধ্যে সর্ব প্রথম দুর্বলতা আসলো এভাবে যে, তাদের সমাজের একজন অপরজনকে (অন্যায় কাজে জড়িত) দেখলে বলত, আপনি আল্লাহকে ভয় করুন এবং যা করেছেন তা পরিত্যাগ করুন, একাজ আপনার জন্য বৈধ নয়। অত:পর পরদিন তাকে অন্যায়ে লিপ্ত দেখত, কিন্তু (খারাপ লোকটির) অন্যায় তাকে (সৎলোকটিকে) তার সাথে সামাজিক সম্পর্ক রাখতে বাধা দিত না। অন্যায়ে জড়িত থাকা সত্ত্বেও সে তার সাথে একত্রে উঠা-বসা, খাওয়া-দাওয়া ও সামাজিকতা রক্ষা করে চলত। যখন তারা এরূপ করতে লাগল, তখন আল্লাহ তাদের সামাজিক সম্প্রীতি ও ঐক্য নষ্ট করে দেন, তাদের মধ্যে বিভেদ, কলহ ও বৈরিতা সৃষ্টি করে দেন।একথা বলার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোরআনুল কারিমের দুটি আয়াত (সূরা মায়িদার ৭৮-৭৯ আয়াত) তেলাওয়াত করেন: ইসরাঈল সন্তানদের মধ্য থেকে যারা কুফরি করেছিল তারা দাউদ ও মরিয়ম পুত্র ঈসা কর্তৃক অভিশপ্ত হয়েছিল, একারণে যে তারা অবাধ্য হয়েছিল এবং সীমা লঙ্ঘন করেছিল। তাদের মধ্যে সংঘটিত অন্যায়

ও গর্হিত কাজ থেকে তারা একে অপরকে নিষেধ করত না। তাদের এই আচারণ ছিল অত্যন্ত নিকৃষ্ট।অত:পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

> মহান আল্লাহর কসম করে বলছি, তোমরা অবশ্যই সৎ কর্মের আদেশ করবে, অন্যায় থেকে নিষেধ করবে, অন্যায়কারী বা অত্যাচারীকে হাত ধরে বাধা দান করবে, তাকে সঠিক পথে ফিরে আসতে বাধ্য করবে। যদি তোমরা তা না কর তবে আল্লাহ তোমাদের মধ্যে পরস্পর বিরোধিতা ও শত্রুতা সৃষ্টি করে দিবেন এবং তোমাদেরকে অভিশপ্ত করবেন যেমন ইসরাঈল সন্তানদেরকে অভিশপ্ত করেছিলেন। (আবু দাউদ ও অন্যান্য । সনদ মোটামুটি গ্রহণযোগ্য।)

- **পাপ ও অভিশাপ অর্জন**
  আদেশ-নিষেধের দায়িত্বে অবহেলাকারী নিজে পাপ না করেও অন্যের পাপের কারণে গোনাহ ও লানতের অংশীদার হন।
  রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

> অচিরেই তোমাদের উপর অনেক শাসক-প্রশাসক আসবে যারা ন্যায় ও অন্যায় উভয় প্রকারের কাজ করবে। যে ব্যক্তি তাদের অন্যায়কে ঘৃণা করবে সে অন্যায়ের অপরাধ থেকে মুক্ত হবে আর যে ব্যক্তি আপত্তি করবে সে (আল্লাহর অসন্তুষ্টি থেকে) নিরাপত্তা পাবে। কিন্তু যে এ সকল অন্যায় কাজ মেনে নেবে বা তাদের অনুসরণ করবে (সে বাঁচতে পারবে না) সাহাবিগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমরা কি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব না? তিনি বললেন, না, যতক্ষণ তারা সালাত আদায় করবে। (মুসলিম)।

অন্য হাদিসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

> যখন পৃথিবীতে কোনো পাপ সংঘটিত হয় তখন পাপের নিকট উপস্থিত থেকেও যদি কেউ তা ঘৃণা করে বা আপত্তি করে তবে সে ব্যক্তি অনুপস্থিত ব্যক্তির মত পাপ মুক্ত থাকবে। আর যদি কেউ অনুপস্থিত থেকেও পাপটির বিষয়ে সন্তুষ্ট থাকে বা মেনে নেয় তাহলে সে তাতে উপস্থিত থাকার পাপে পাপী হবে। (আবু দাউদ। সনদ গ্রহণযোগ্য)।

অন্য হাদিসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

> যেখানে কোনো মানুষকে হত্যা করা হয় সেখানে কখনই দাঁড়াবে না, কারণ সেখানে উপস্থিত লোকেরা যদি তার হত্যা প্রতিরোধ না করে তাহলে সকলের উপর

> লানত ও অভিশাপ বর্ষিত হয়। আর যেখানে কোনো মানুষকে অত্যাচার করে মারধর করা হয় সেখানে দাঁড়াবে না। কারণ, উপস্থিত সকলের উপরেই লানত-অভিশাপ বর্ষিত হয়। (আহমাদ, তাবারানি, বাইহাকি। বাইহাকির সনদটি হাসান বলে ইরাকি এহইয়াউ উলুমিদ্দীনের তাখরিজে উল্লেখ করেছেন)

অন্য হাদিসে তিনি বলেন:

> ❝ তোমাদের কেউ যেন নিজেকে ছোট মনে না করে। সে যদি দেখে যে কোথাও কোনো বিষয়ে আল্লাহর পক্ষ থেকে তার কোনো কথা বলা উচিত তখন যেন সে কথা বলা থেকে বিরত না থাকে। তাহলে আল্লাহ তাকে বলবেন, তুমি এ বিষয়ে কেন কথা বলনি? সে বলবে, হে আল্লাহ! আমি মানুষদেরকে ভয় পেয়েছিলাম। তখন তিনি বলবেন, আমার অধিকারই তো বেশি ছিল যে, তুমি আমাকেই বেশি ভয় করবে। (আহমাদ, সনদ সহিহ)

সমাজের নানাবিধ প্রকাশ্য অন্যায়, জুলুম, গণপিটুনি, বেহায়াপনা, অশ্লীল নাচগান, জুয়া, খুন-খারাবী, মারামারি-দাঙ্গা ইত্যাদির নীরব দর্শক হওয়ার ভয়াবহ পরিণতি আমরা এ হাদিস থেকে বুঝতে পারছি। এ সকল ক্ষেত্রে সাধ্য মত দাওয়াত দেওয়ার ও অন্যায়ের প্রতিবাদ করার চেষ্টা করতে হবে। না হলে দ্রুত এরূপ স্থান পরিত্যাগ করতে হবে। আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর সন্তুষ্টির পথে চলার ও অসন্তুষ্টি থেকে আত্মরক্ষা করার তাওফিক দান করুন।

দাওয়াতের শর্ত ও দায়ীর গুণাবলী

আল্লাহর পথে দাওয়াত এবং পুরস্কার ও শাস্তি- এই দুই পোস্টের আলোচনা আলোচনা থেকে আমরা নসিহত, প্রচার, ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধ এককথায় আল্লাহর পথে দাওয়াতের গুরুত্ব সম্পর্কে জানতে পেরেছি। এখন আমাদের দেখতে হবে, এ দায়িত্ব পালনের জন্য শর্তাবলী কি ? দায়ী ও মুবাল্লিগ অর্থাৎ দাওয়াত দানকারী ও প্রচারকের মধ্যে কি কি গুণাবলী বিদ্যমান থাকা প্রয়োজন? কারণ শরিয়ত সম্মতভাবে দায়িত্ব পালন না করলে আমরা ভাল কাজ করতে যেয়ে পাপে লিপ্ত হয়ে পড়ব। সে দিকটি বিবেচনা করে আমরা কিছু শর্ত ও গুণাবলী নিম্নে প্রদান করেছি:

ইলম বা জ্ঞান

দাওয়াতের দায়িত্ব পালনের জন্য প্রথম শর্ত হলো, ন্যায়-অন্যায়, তার পর্যায় এবং সেগুলির প্রতিবাদ-প্রতিকারের ইসলামি পদ্ধতি সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান। আমি যে কাজ করার বা বর্জন করার দাওয়াত দিচ্ছি তা সত্যিই ইসলামের নির্দেশ কিনা তা জানতে হবে। ভালমন্দ অনেক ক্ষেত্রে সকল মানুষই বিবেক ও জ্ঞান দিয়ে বুঝতে পারেন। খুন, জুলুম, রাহাজানি, চুরি , ডাকাতি, মারামারি, নেশা-মাদকাশক্তি ইত্যাদি অগণিত অন্যায় কাজকে অন্যায় বলে জানতে বেশি জ্ঞানের প্রয়োজন হয় না। অনুরূপভাবে মানুষকে সাহায্য করা, সান্ত্বনা দেওয়া, সৃষ্টির কল্যাণে এগিয়ে আসা ইত্যাদি ভাল কাজ বলে সবাই বুঝি। কিন্তু ইসলামি কর্মকাণ্ড বা ধর্মীয় নির্দেশনা বিষয়ক অগণিত বিষয় রয়েছে যে সম্পর্কে স্পষ্ট জ্ঞান না থাকলে মানুষ অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে নিজেই অন্যায়ে লিপ্ত হবেন। অথবা সৎকার্যে আদেশ দান করতে যেয়ে অসৎকার্য আদেশ করবেন। যেমন একব্যক্তি চুক্তিবদ্ধ কাজ করছেন বা স্ত্রী-সন্তানদের প্রতিপালনের জন্য জরুরি কাজ করছেন। কাজটি তার জন্য ফরজে আইন। আপনি তাকে এই দুনিয়াবী কাজ বর্জন করে নফল বা ফরজে কিফায়া পর্যায়ের মাহফিল, মিছিল, মিটিং বা দাওয়াতে অংশগ্রহণ করতে অহবান করলেন। অথবা একব্যক্তি ওজরের কারণে দাঁড়িয়ে পেশাব করছেন দেখে আপনি তাকে যাচ্ছেতাই গালি-গালাজ করলেন। উভয় ক্ষেত্রে আপনি ন্যায় করতে যেয়ে অন্যায়ে লিপ্ত হলেন। এরূপ অগণিত উদাহরণ আমরা দেখতে পাব। এজন্য ধর্মীয় বিধি-বিধান সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির ক্ষেত্রে মুমিনের উচিত বিষয়টি কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ বা অন্যায় তা স্পষ্টভাবে না জেনে হটকারিতায় লিপ্ত না হওয়া। দাওয়াতের ক্ষেত্রে স্পষ্ট জ্ঞানের অত্যাবশ্যিকতা বিষয়ে আল্লাহ বলেন:

“ বল, এটিই আমার পথ। স্পষ্ট জ্ঞানের ভিত্তিতে আল্লাহর দিকে আহবান করি আমি এবং আমার যারা অনুসারী। (সূরা ইউসুফ ১০৮ আয়াত)।

এ স্পষ্ট জ্ঞান হলো ওহীনির্ভর জ্ঞান বা কোরআন ও হাদিসের স্পষ্ট নির্দেশনা। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

“ বল আমি তো শুধু ওহীর ভিত্তিতেই তোমাদেরকে ভয় প্রদর্শন করছি। (সূরা আম্বিয়া: ৪৫)

সূরা আহকাফের ৯ নম্বর আয়াত ও অন্যান্য স্থানে একই কথা বলা হয়েছে। এজন্য দাওয়াতের দায়িত্ব পালনকারীকে কোরআন ও হাদিসের আলোকে স্পষ্টরূপে জানতে হবে, যে কাজ করতে বা বর্জন করতে তিনি দাওয়াত দিচ্ছেন তার শরয়ি বিধান কি এবং তা পালন-বর্জনের দাওয়াতের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শেখানো পদ্ধতি কি? কাজটি সৎকর্ম হলে তা ফরজ,

ওয়াজিব, মুসতাহাব ইত্যাদি কোন পর্যায়ের ইত্যাদি স্পষ্ট কোরআন ও হাদিসের আলোকে জানতে হবে। ওহীর স্পষ্ট নির্দেশনা ব্যতীত সাধারণ ধারণা, আবেগ আন্দাজ ইত্যাদির ভিত্তিতে কোনো কিছুকে হালাল বা হারাম বলতে কোরআনুল কারিমে নিষেধ করা হয়েছে। এরশাদ করা হয়েছে:

❝ তোমাদের জিহবা দ্বারা মিথ্যা আরোপ করে (মনগড়াভাবে) বলবে না যে, এটি হালাল ও এটি হারাম। এভাবে আল্লাহর নামে মিথ্যা উদ্ভাবন করা হবে। যারা আল্লাহর নামে মিথ্যা উদ্ভাবন করে তারা সফল হয় না। (সূরা নাহল: ১১৬)

দায়ী ও মুবাল্লিগকে অবশ্যই সর্বদা বেশি বেশি কোরআন ও হাদিস, তাফসির, ফিকাহ, ও অন্যান্য ইসলামি গ্রন্থ অধ্যায়ন করতে হবে। কোরআন-হাদিস বাদ দিয়ে শুধুমাত্র আলেমদের রচিত গ্রন্থদি পড়ে দীনকে জানার চেষ্টা করা কঠিন অন্যায় এবং কোরআন হাদিসের প্রতি অবহেলা ও অবজ্ঞা প্রদর্শন। মহান আল্লাহ কোরআনকে সকল মানুষের হেদায়েতরূপে প্রেরণ করেছেন। তিনি তা বুঝা সহজ করে দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতের জন্য তাঁর মহান সুন্নাত ও হাদিস রেখে গিয়েছেন। এগুলির সার্বক্ষণিক অধ্যায়ন মুমিনের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত, শ্রেষ্ঠতম জিকর ও দাওয়াতের প্রধান হাতিয়ার।

সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির প্রতি ভালবাসা ও আন্তরিকতা

আদেশ-নিষেধ, নসিহত, বা আল্লাহর পথে আহবান করার ক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয় হল, যাকে আদেশ করছি বা আহবান করছি তার প্রতি হৃদয়ের ভালবাসা ও আন্তরিক মঙ্গল কামনা। এ জন্যই দাওয়াতের এ কর্মকে কোরআন ও হাদিসে নসিহত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আমরা দেখছি যে, নসিহতের মূল অর্থ আন্তরিক ভালবাসা ও মঙ্গল কামনা। আল্লাহর পথে আহবানকারী বা আদেশ নিষেধকারী কারো ভুল ধরে দেওয়া, নিজের জ্ঞান প্রদর্শন বা নিজের মাতব্বরি প্রতিষ্ঠার জন্য এই কাজ করবেন না। বরং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির প্রতি হৃদয়ের ভালবাসার টানেই এ দায়িত্ব পালন করবেন।

অন্যায়ে লিপ্ত বা বিভ্রান্ত যে ব্যক্তিকে তিনি দাওয়াত দিচ্ছেন তার প্রতি তার হৃদয়ের অনুভূতি হবে বিপদগ্রস্ত আপনজনের মত। যার বিপদে তিনি ব্যাথা অনুভব করছেন এবং যাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করার জন্য হৃদয়ের আকুতি অনুভব করছেন। তাকে সঠিক পথের নির্দেশনা দিলে যদি সে তা না মানে বা বিরোধিতা করে তবে আহবানকারী মুমিনের হৃদয়ে ক্রোধ বা প্রতিহিংসা জাগ্রত হবে না, বরং বেদনা ও দুশ্চিন্তা তার হৃদয়কে আচ্ছন্ন করবে। বেদনায় তার হৃদয় দুমড়ে মুচড়ে উঠবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এই অবস্থার কথা আল্লাহ কোরআনুল কারীমের একাধিক স্থানে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ বলেছেন:

“ তারা এই বাণীতে বিশ্বাস স্থাপন না করলে সম্ভবত আপনি তাদের পিছনে ঘুরে দু:খ-বেদনায় নিজেকে ধ্বংস করে ফেলবেন। (সূরা কাহফ: ১০)

সূরা শুআরা-এর ৩ নং আয়াতেও অনুরূপ বলা হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র জীবনে এই ভালবাসা ও প্রেমের অগণিত উদাহরণ আমরা দেখতে পাই। যে কাফিরগণ তাঁর দেহকে রক্তরঞ্জিত করছে তাদেরই জন্য তিনি আল্লাহর দরবারে ক্ষমা ও করুণা প্রর্থনা করছেন। তিনি তাঁর কপালের রক্ত মুছছেন আর বলছেন,

“ হে আমার প্রতিপলক, আমার জাতিকে ক্ষমা করে দিন, কারণ তারা জানে না। (বুখারি ও মুসলিম, ফতহুল বারী)

মক্কাবাসীদের অত্যাচারে জর্জরিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তায়েফে যেয়ে পেলেন নির্মমতম অত্যাচার। সে সময়ে জিবরাঈল (আ.) পাহাড়ের ফিরিশতাকে নিয়ে তাঁর নিকট আগমন করে বললেন, আপনার অনুমতি হলে পাহাড় উঠিয়ে এ জনপদকে ধ্বংস করে দেওয়া হবে। কঠিনতম কষ্টের সে মুহূর্তেও তিনি বললেন:

“ না বরং আমি আশা করি যে, আল্লাহ হয়ত এদের ঔরস থেকে এমন মানুষের জন্ম দেবেন যারা একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কিছু শরিক করবে না। (বুখারি ও মুসলিম)

সুবহানাল্লাহ! কত বড় ধৈর্য! কত মহান প্রেম!! আমরা যারা সামান্য বিরোধিতায় উত্তেজিত হয়ে গালাগালি করি ও প্রতিশোধের পরিকল্পনায় বিভোর হই তাদের একটু চিন্তা করা দরকার!

ব্যক্তিগত আমল

দায়ী ইলাল্লাহ বা আল্লাহর পথে আহবানকারী ও আদেশ-নিষেধকারী অবশ্যই তাঁর প্রচারিত আদর্শের প্রতি নিষ্ঠাবান, বিশ্বাসী ও পালনকারী হবেন। সারা বিশ্বে যিনি আল্লাহর দ্বীন ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আদর্শের বিজয় ও প্রতিষ্ঠা দেখতে চান, তাকে সবার আগে তার ব্যক্তিগত জীবনের সকল ক্ষেত্রে ও সকল দিকে এ আদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে, সংশ্লিষ্ট আদর্শ নিজের জীবনে প্রতিষ্ঠার চেয়ে অন্যকে দাওয়াত দেওয়া আনেক বেশি সহজ ও আকার্ষণীয় কাজ। এজন্য শয়তান এবং মানবীয় প্রবৃত্তির কাছে তা খুবই প্রিয়। এর শাস্তিও খুব কঠিন।

ইহুদিরা সর্বদা ধর্ম ও মানবতার বিষয়ে সবচেয়ে আকর্ষণীয় আদর্শের বুলি আউড়ায় কিন্তু নিজেরা এর সম্পূর্ণ বিপরীত কাজ করে। মহান আল্লাহ এরশাদ করেছেন:

> তোমরা কি মানুষদেরকে সৎকার্যে নির্দেশ দাও আর নিজেদের কথা ভুলে যাও! অথচ তোমরা কিতাব অধ্যায়ন কর! তবে কি তোমরা বুঝ না। (সূরা বাকারা : ৪৪)

দ্বীনের দাওয়াত ও প্রতিষ্ঠার কাজে লিপ্ত অনেকেই বুঝে অথবা না বুঝে এ অপরাধে অপরাধী। ইসলামের দাওয়াত ও প্রতিষ্ঠার কথা বললেও ব্যক্তিগত ইবাদত, আচরণ, পারিবারিক সম্পর্ক, স্ত্রী, সন্তান, পিতামাতা, প্রতিবেশী, আত্মীয়স্বজন, কর্মস্থল, সহকর্মী ও অন্যান্য মানুষের অধিকার আদায় ইত্যাদি অনেক ক্ষেত্রে আমরা অত্যন্ত দুর্বল। এদিকে আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে। দুই পর্যায়ে আমরা এ অপরাধে লিপ্ত হই:

- প্রথমত: যে কার্যের জন্য আদেশ বা নিষেধ করছি তা আমরা নাজেরাই পালন বা বর্জন করছি না। যেমন আমরা প্রতিবেশীর অধিকার পালন অথবা সুদ বর্জনের দাওয়াত দিচ্ছি, কিন্তু নিজেরাই প্রতিবেশীর অধিকার নষ্ট করছি বা সুদে লিপ্ত রয়েছি।
- দ্বিতীয়ত: আমরা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অপরাধী না হলেও, অন্যান্য সমপর্যায়ের অপরাধে লিপ্ত রয়েছি। যেমন আমরা সুদ খাচ্ছি না, তবে ঘুষ, যৌতুক, কর্মে ফাঁকি, ভেজাল ইত্যাদি অপরাধে লিপ্ত আছি।
  মহান আল্লাহ বলেন:

  > হে মুমিনগণ! তোমরা যা কর না তা তোমরা কেন বল? আল্লাহর দৃষ্টিতে অতিশয় অসন্তোষজনক যে, তোমরা যা কর না বলবে। (সূরা সফ:২-৩)

  সূরা বাকারার ২০৪ আয়াত ও সূরা মুনাফিকুন-এর ৪ আয়াতেও আমরা কথা ও কর্মের বৈপরিত্যের কঠিন নিন্দা দেখতে পাই।
  রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

  > কেয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে আনায়ন করে জাহান্নামের অগ্নির মধ্যে নিক্ষেপ করা হবে। আগুনে তার নাড়িভুড়ি বেরিয়ে পড়বে এবং গাধা যেমন যাতা (ঘানি) নিয়ে ঘুরে তেমনি সে ঘুরতে থাকবে। তখন জাহান্নামবাসীরা তার নিকট সমবেত হয়ে বলবে, হে অমুক, তোমার কি হল? তুমি না আমাদেরকে সৎকার্যে আদেশ দিতে এবং অসৎকার্য থেকে নিষেধ করতে? সে বলবে আমি তোমাদেরকে সৎকার্যে আদেশ দিতাম কিন্তু নিজে করতাম না। আর অসৎকার্য থেকে নিষেধ করতাম, কিন্তু নিজেই তা করতাম। (বুখারি)

  আমরা মহান আল্লাহর নিকট এমন করুন পরিণতি থেকে আশ্রয় চাই।

ব্যক্তিগত অমলে ত্রুটি সহ দাওয়াতের বিধান

উপরের আয়াত ও হাদিস থেকে বুঝতে পারছি যে, নিজে পালন না করে অন্যকে দাওয়াত দেওয়া অন্যায়। তবে দাওয়াত বা আদেশ নিষেধ ফরজে আইন পর্যায়ের হলে নিজের আমলে ত্রুটি থাকলেও আদেশ নিষেধ করতে হবে । যেমন একব্যক্তি ধুমপান করেন বা ঠিকমত জামাতে নামাজ পড়েন না। তিনি তার অধিনস্ত বা পরিবারের সদস্য কাউকে এ পাপে লিপ্ত দেখলে তার জন্য তাকে আদেশ বা নিষেধ করা ফরজে আইন দায়িত্ব হয়ে যাবে। এ অবস্থায় আদেশ নিষেধ না করলে তিনি দ্বিতীয় একটি অন্যায় ও অপরাধের মধ্যে পতিত হবেন।

বিনম্রতা ও বন্ধুভাবাপন্নতা

দাওয়াতের ক্ষেত্রে অন্যতম মৌলিক শর্ত হলো বিনম্রতা ও বন্ধুভাবাপন্নতা। আমরা অনেক সময় সৎকার্যে আদেশ বা অন্যায় থেকে নিষেধ করাকে ব্যক্তিগত অহং প্রতিষ্ঠার পর্যায়ে নিয়ে যাই। ফলে আমরা কথা বলি মাতব্বরি ভঙ্গিতে যা অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানুষের অহংবোধে আঘাত করে এবং আমাদের কথা গ্রহণ করতে বাধা দেয়। এরপর যখন সে তা গ্রহণ না করে বা আমাদের বিরুদ্ধে খারাপ কথা বলে তখন আমরা তাকে ইসলামের শত্রু আখ্যায়িত করে কঠিনভাবে তার বিরুদ্ধে আক্রোশমূলক কথা বলি। এগুলি সবই কঠিন অন্যায় এবং আল্লাহর পথ থেকে মানুষকে দূরে সরিয়ে দেওয়ার পথ। আমরা অনেক সময় গরম কথা বা কড়া কথা বলাকে সাহসিকতা ও জিহাদ বলে মনে করি। অথচ আল্লাহ কোরআনুল কারীমে নরম কথা বলার নির্দেশ দিয়েছেন।

আল্লাহ হক কথা বলতে নির্দেশ দিয়েছেন কিন্তু গরম কথা বলতে কখনও নির্দেশ দেননি। হক্ক কথাকে নরম করে বলতে নির্দেশ দিয়েছেন। বিশ্বের অন্যতম তাগুত আল্লাহদ্রোহী জালিম ফিরাউনের কাছে মূসা ও হারুন আ. কে প্রেরণ করে তিনি নরম কথার নির্দেশ দিয়ে বলেন:

> তোমরা উভয়ে ফিরাউনের নিকট গমন কর, সে অবাধ্যতা ও সীমালংঘন করেছে। তোমরা তার সাথে নরম কথা বলবে, হয়ত সে উপদেশ গ্রহণ করবে বা ভয় করবে। (সূরা ত্বহা : ৪৩-৪৪)

এ যদি হয় কাফিরকে দাওয়াত দেওয়ার বা আদেশ-নিষেধের ক্ষেত্রে নবী –রাসূলগণের প্রতি নির্দেশ, তাহলে যারা কালিমা পড়েছেন তাদেরকে আদেশ নিষেধ করার ক্ষেত্রে আমাদের আরো কত বিনম্র ও বন্ধুভাবাপন্ন হওয়া উচিত তা একটু চিন্তা করুন।
আল্লাহ তায়ালা বলেন:

> তারা আল্লাহকে ছেড়ে যাদেরকে ডাকে তাদেরকে তোমরা গালি দিবে না কারণ ফলে তারা সীমালংঘন করে অজ্ঞতা বশত আল্লাহকে গালি দিবে। (সূরা আনআম : ১০৮)

এ যদি হয় কাফেরদের দেবদেবীর ক্ষেত্রে আল্লাহর নির্দেশ, তাহলে কালিমা পাঠকারী মুসলিম বলে পরিচিত ব্যক্তিকে আদেশ নিষেধ করতে যেয়ে তাকে তার ভ্রান্ত বা জাগতিক মতের নেতা বা সাথীদেরেক গালি দেওয়া কিভাবে বৈধ হবে? গালাগালি, কঠোরতা, হিংসা, ঘৃণা, গীবত, অহংকার ইত্যাদি দ্বারা অন্যায়ের প্রতিবাদ করলে তাতে মূলত নিজেদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করা হবে, কোন ইবাদত পালন করা হবে না। আল্লাহ আমাদেরকে রক্ষা করুন।

সম্মানিত পাঠক, দাওয়াত বা সৎকাজের নির্দেশনা ও অসৎকাজের নিষেধ-এর উদ্দেশ্য মানুষের উপরে মাতব্বরি করা বা মানুষের ভুল ধরা নয়। বরং মানুষদেরকে সৎপথে আহবান করা এবং যথাসম্ভব মানুষকে ভাল পথে আসতে সাহায্য করা। এজন্য সর্বোচ্চ বিনম্রতা, ভদ্রতা ও ধৈর্য প্রয়োজন। সবচেয়ে বড় দায়ী ও আদেশ নিষেধকারী ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আর তার অন্যতম বৈশিষ্ট ছিল বিনম্রতা। বিনম্রতা ও ধৈর্যের অনুপম আদার্শ দিয়ে তিনি জয় করেছিলেন অগণিত বেদুঈন আরবের কঠিন হৃদয়। অস্ত্র বা শক্তি দিয়ে তিনি ইসলাম প্রতিষ্ঠা করেননি। অনুপম চরিত্র ও ভালবাসাময় আদেশ নিষেধ বা দাওয়াত দিয়ে হৃদয়গুলিকে জয় করে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন মদিনার রাষ্ট্র। এরপর সে রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা করেছেন যুদ্ধের মাধ্যমে। মহান আল্লাহ হৃদয় জয়ের এ কাহিনী বিদ্ধৃত করে বলেছেন,

❝ আল্লাহর দয়ার অন্যতম প্রকাশ যে আপনি তাদের প্রতি বিনম্র-কোমল হৃদয় ছিলেন। যদি আপনি রূঢ় ও কঠোর চিত্ত হতেন তাহলে তারা আপনার আশপাশ থেকে সরে পড়ত। (সূরা আলে ইমরান : ১৫৯)

একটি হাদিসে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন,

❝ কতিপয় ইহুদি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এসে বলল, আস-সামু আলাইকুম (আপনার উপর মরণ অভিশাপ)। আয়েশা রা. রাগন্বিত হয়ে বলেন, তোমাদের উপর মরণ, তোমাদেরকে আল্লাহ অভিশপ্ত করুন এবং তোমাদের উপর তার ক্রোধ অবতীর্ণ হোক। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আয়েশা শান্ত হও। তুমি অবশ্যই সর্বদা বিনম্রতা ও বন্ধুভাবাপন্নতা অবলম্বন করবে। আল্লাহ সকল বিষয়ে বিনম্রতা ও বন্ধুভাবাপন্নতা ভালবাসেন। আর খবরদার! কখনই তুমি উগ্রতা ও অভদ্রতার নিকটবর্তী হবে না। আয়েশা রা. বলেন, তারা কী বলেছে আপনি কি তা শুনেননি? তিনি বলেন, আমি কি বলেছি তা কি তুমি শোন নি? আমি বলেছি, ওয়ালাইকুম অর্থাৎ তোমাদের উপরে। (বুখারি মুসলিম)

উত্তম দিয়ে মন্দ প্রতিহত করা

দাওয়াত বা দীন প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে ধৈর্য, ক্ষমা ও উত্তম ব্যবহারের দ্বারা খারাপ আচরণের প্রতিরোধ করতে নির্দেশ দিয়েছেন আল্লাহ। আল্লাহ বলেন:

❝ কথায় কে উত্তম ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা যে আল্লাহর দিকে আহবান করে, সৎকর্ম করে এবং বলে, আমি আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত। ভাল এবং মন্দ সমান হতে পারে না। (মন্দ) প্রতিহত কর উৎকৃষ্টতর (আচারণ) দ্বারা; ফলে তোমার সাথে যার শত্রুতা আছে সে হয়ে যাবে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত। এ গুণের অধিকারী করা হয় কেবল তাদেরকেই যারা ধৈর্যশীল, এ গুণের অধিকারী করা হয় কেবল তাদেরকেই যারা মহা সৌভাগ্যবান। (সূরা ফুসসিলাত : ৩৩-৩৫)

মহান আল্লাহ বলেছেন:

❝ মন্দের মুকাবিলা কর যা উৎকৃষ্টতর তা দিয়ে, তারা যা বলে আমি সে সম্পর্কে বিশেষ অবহিত। (সূরা মুমিনুন : ৯৬)

বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে মনে রাখতে হবে। দাওয়াতের ক্ষেত্রে গালির পরিবর্তে গালি, নিন্দার প্রতিবাদে নিন্দা, রাগের প্রতিবাদে রাগ ইত্যাদি নিষিদ্ধ। এসব মন্দ আচরণের প্রতিরোধ করতে হবে উৎকৃষ্টতর আচরণ দিয়ে। অথচ আমরা অনেক সময় এই নির্দেশের বিপরীত কর্ম করি। কেউ প্রতিবাদ করলে বা খারাপ আচরণ করলে আমরা তার আচরণের চেয়ে নিকৃষ্টতর আচরণের মাধ্যমে তার প্রতিবাদ বা প্রতিরোধ করি!!

সুন্দর ব্যবহার ও আচরণ

দায়ী বা সৎকার্যে আদেশ ও অসৎকার্যে নিষেধকারীকে অবশ্যই তাঁর নেতা রাসূলুল্লাহর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মত মহোত্তম আচরণের অধিকারী হতে হবে। আরবিতে একে (خلق) বা আখলাক বলা হয়। বাংলায় সাধারণত একে চরিত্র বলা হয়। আর আরবিতে আখলাক শব্দ আরো প্রশস্ত। মানুষের সাথে মানুষের আচরণ ও ব্যবহারের সামগ্রিক অবস্থাকেই আরবিতে খুলুক বলা হয়। এজন্য খুলুক বা আখলাককে বাংলায় আচরণ বা ব্যবহার বলাই উত্তম।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

❝ আর নিশ্চয় তুমি মহান চরিত্র ও ব্যবহারের উপর অধিষ্ঠিত। (সূরা আল কলম : ৪)

এ মহান আচরণের বিভিন্ন দিক রয়েছে। উপরে উল্লেখিত বিনম্রতা, বন্ধুভাবাপন্নতা, উৎকৃষ্ট দিয়ে মন্দ প্রতিহত করা ইত্যাদিও এই খুলুকে আজিম বা মহান আচরণের অংশ। তবে এর আরো বিভিন্ন দিক

রয়েছে যা দায়ী ইলাল্লাহকে অর্জন করতে হবে। শুধু দাওয়াতের ক্ষেত্রেই নয়, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এ ব্যবহার বা আচরণ আল্লাহর পথে আহবানকারীর জীবনকে আলোকিত করবে এবং তার চারিধারে ফুলের সৌরভ ছড়াবে।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মহান আচরণের বিভিন্ন দিক বিস্তারিত আলোচনা করতে পৃথক গ্রন্থ প্রয়োজন। এখানে কয়েকটি দিক উল্লেখ করা যায়:

- ১. সর্বাবস্থায় অশ্লীল কথা, অশালীন কথা, গালিগালাজ ও কটুক্তি বর্জন করা। বিভিন্ন হাদিসে বারংবার বলা হয়েছে,

  > রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অশালীন, অশ্লীল, অশোভনীয় কথা বলতেন না, গালি দিতেন না, কটুক্তি করতেন না। (বুখারি, মুসলিম ও অন্যান্য)।

- ২. বেশি কথা বলা, দম্ভভরে বা চিবিয়ে কথা বলা, অহঙ্কার করা, বিতর্ক করা, মিথ্যা কথা বলা ইত্যাদি পরিহার করা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

  > তোমাদের মধ্যে আমার সবচেয়ে প্রিয় এবং কিয়ামতের দিন আমার সবচেয়ে নিকটবর্তী অবস্থানের অধিকারী হবে তারা যারা তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম আচরণের অধিকারী। আর তোমাদের মধ্যে আমার নিকট সবচেয়ে বেশি ঘৃণিত এবং কিয়ামতের দিন আমার থেকে সবচেয়ে দূরে অবস্থান করবে তারা যারা বেশি কথা বলে, যারা কথা বলে জিতে যেতে চায়, বাজে কথা বলে এবং যারা অহঙ্কার করে। (তিরমিজি, হাদিসটি হাসান।)

  অন্য হাদিসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

  > > নিজের মতটি হক হওয়া সত্ত্বেও যে ব্যক্তি বিতর্ক পরিত্যাগ করল আমি তার জন্য জান্নাতের পাদদেশে একটি বাড়ির জিম্মাদারী গ্রহণ করলাম। আর যে ব্যক্তি হাসি-মশকারার জন্যও মিথ্যা বলে না আমি তার জন্য জান্নাতের মধ্যবর্তী স্থানে একটি বাড়ির জিম্মাদারী গ্রহণ করলাম। আর যার আচরণ-ব্যবহার সুন্দর আমি তার জন্য জান্নাতের সর্বোচ্চ স্থানে একটি বাড়ির জিম্মাদারী গ্রহণ করলাম। (আবু দাউদ, হাসান, সহীহুল জামে।)

- ৩. সকলের সাথে আনন্দিত চিত্তে, হাসিমুখে কথা বলা এবং কথার সময় পরিপূর্ণ মনোযোগ ও আগ্রহ সহকারে তার কথা শোনা। যেন তার প্রতি ভালবাসা ও আন্তরিকতা পূর্ণভাবে ফুটে উঠে। আমর ইবনুল আস রা. বলেন:

> রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমাজের নিকৃষ্টতম ব্যক্তির সাথেও পরিপূর্ণ মনোযোগ দিয়ে তার দিকে পূর্ণ মুখ ফিরিয়ে কথা বলতেন। এভাবে তিনি তার হৃদয় জয় করে নিতেন। তিনি আমার সাথেও কথা বলতেন পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে এবং আমার দিকে পূর্ণরূপে মুখ ফিরিয়ে। এমনকি আমার মনে হতো যেন আমিই সমাজের শ্রেষ্ঠ মানুষ। (তাবরানি, হাসান।)

এখানে উল্লেখ্য যে, মানুষের প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা, শ্রদ্ধাবোধ এবং অহংকারহীন হৃদয় না হলে এগুণ পুরোপুরি অর্জন করা যায় না।
উত্তম আচরণ শুধু দাওয়াতের সফলতার চাবিকাঠিই নয়, উপরন্তু আখেরাতের সফলতার সর্বোত্তম উপায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

> কিয়ামতের দাড়িপাল্লায় উত্তম আচরণের চেয়ে বেশি ভারি কোনো আমল আর রাখা হবে না। আর উত্তম আচরণের অধিকারী ব্যক্তি এ আচরণের দ্বারাই তাহাজ্জুদ ও নফল রোযা পালনকারীর মর্যাদা অর্জন করবে। (তিরমিজি, আহমদ, আবু দাউদ, হদিসের সূত্র সহীহ, সহীহুল জামে।)

সবর বা ধৈর্য

উপর্যুক্ত গুণগুলি অর্জন করতে ধৈর্যের অনুশীলন করতে হবে। পূর্বোল্লিখিত একটি আয়াতে আমরা দেখেছি যে, উৎকৃষ্ট দিয়ে মন্দ প্রতিহত করার গুণ শুধু ধৈর্যশীলগণই অর্জন করতে পারেন এবং তারাই মহা সৌভাগ্যবান। দাওয়াত ও ধৈর্য অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

> সালাত কায়েম কর, সৎকার্যে আদেশ কর, অসৎকার্যে নিষেধ কর এবং তোমার উপর যা নিপতিত হয় তাতে ধৈর্য ধারণ কর। নিশ্চয় এগুলিই দৃঢ়সংকল্পের কাজ।(সূরা লুকমান : ১৭)

সূরা আলে ইমরানের ১৮৬ আয়াত এবং সূরা আল-আসরেও অনুরূপ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ধৈর্যের মূল পরিচয় হল রাগের সময়। আল্লাহর পথে ডাকতে বা ভাল কাজের আদেশ ও খারাপ কাজের নিষেধ করতে গেলেই অনেক মানুষের নিকট থেকে বিরূপ কথা, গালমন্দ, নিন্দা ইত্যাদি শুনতে হবে এবং এতে কখনো প্রচণ্ড রাগ হবে এবং কখনো মন দু:খভরাক্রান্ত হবে। উভয় ক্ষেত্রেই আমাদেরকে ধৈর্যের মাধ্যমে এর মুকাবিলা করতে হবে এবং উৎকৃষ্ট দিয়ে মন্দ প্রতিহত করতে হবে। কোরআন কারীমে বারংবার মুমিনদেরকে ধৈর্য অবলম্বন করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ক্রোধের সময় ধৈর্য ধারণ করা এবং ক্রোধ সংবরণ করাকে মুমিনদের মৌলিক পরিচয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহর পথে টিকে থাকার জন্য ধৈর্য ও সালাতের সাহায্য গ্রহণ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

কাফিরদের নিন্দামন্দ, মিথ্যা-অপবাদ, বিরূপ কথা ও ষড়যন্ত্রের মুকাবিলায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে ধৈর্য ধারণের নির্দেশ দিয়ে সূরা নাহলের ১২৭-১২৮ আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন:

❝ ধৈর্য ধারণ কর, আর তোমার ধৈর্য তো আল্লাহর সাহায্য ছাড়া হবে না। আর তাদের দরুন দু:খ করবে না এবং তাদের ষড়যন্ত্রে মন:ক্ষুন্ন হবে না। আল্লাহ তাদের সঙ্গে আছেন যারা তাকওয়া অবলম্বন করেন এবং যারা সৎকর্ম পরায়ণ। (সূরা নাহল : ১২৭-১২৮)

সালাত, তাসবিহ ও ইবাদত

ধৈর্য অর্জনের অত্যন্ত বড় অবলম্বন হলো সালাত ও দোয়া। কোরআনুল কারীমে একাধিক স্থানে ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে শক্তি অর্জনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সূরা হিজর-এর ৯৭-৯৯ আয়াতে আল্লাহ বলেন:

❝ আমি তো জানি, তারা যা বলে তাতে তোমার অন্তর সংকুচিত হয়। সুতরাং তোমার প্রতিপলকের তাসবিহ-তাহমিদ বা প্রশংসাময় পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর এবং সাজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হও এবং একিন (মৃত্যু) আসা পর্যন্ত তুমি তোমার প্রতিপালকের ইবাদত কর। (সূরা হিজর : ৯৭-৯৯)

আল্লাহর পথে ডাকতে গেলে বা সৎকার্যে আদেশ ও অসৎকার্যে নিষেধ করতে গেলে মানুষের বিরোধিতা, শত্রুতা ও নিন্দার কারণে কখনো ক্রোধে, কখনো বা বেদনায় অন্তর সঙ্কীর্ণ হয়ে যায়। এ মনোকষ্ট দূর করার প্রকৃত ধৈর্য ও মানুষিক স্থিতি অর্জন করার উপায় হলো বেশি বেশি আল্লাহর জিকর, ক্রন্দন ও প্রার্থনা করা। এভাবেই আমরা (Re-active)না হয়ে (Pro-active) হতে পারব। কারো আচরণের প্রতিক্রিয়া আমাদের আচরণকে প্রভাবিত করবে না। আল্লাহর রেজামন্দির দিকে লক্ষ্য রেখে আমরা আচরণ করতে পারব। আমরা সত্যিকার অর্থে মহা- সৌভাগ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারব। আল্লাহ আমাদের কবুল করুন।

বিভিন্ন অজুহাতে এ দায়িত্ব পালনে অবহেলা করা

অনেক সময় আমরা বিভিন্ন অজুহাতে দাওয়াতের দায়িত্ব পালনে অবহেলা করে থাকি। কখনো মনে করি, বলে আর কি হবে, ওরা তো শুনবে না। কখনো ভাবি, আখেরি জামানা, এখন আর বলে লাভ নেই। এ সকল চিন্তা শয়তানি ওয়াসওয়াসা ছাড়া আর কিছুই নয়। আল্লাহর পথে দাওয়াত ,পুরস্কার ও শাস্তি- এবং দাওয়াতের শর্ত ও দায়ীর গুণাবলী: পোস্টগুলোতে উল্লেখিত আয়াত ও হাদিসের আলোকে আমরা দেখতে পেয়েছি যে, বললে শুনবে না এ কারণে বলা থেকে বিরত থাকা জায়েয নয়। মুমিনের দায়িত্ব শুনানো বা পালন করানো নয়, মুমিনের দায়িত্ব কেবল বলা ও প্রচার করা।

আল্লাহর পথে দাওয়াত এবং পুরস্কার ও শাস্তি- এবং পোস্টগুলোতে উল্লেখিত আয়াত ও হাদিসসমূহের নির্দেশনা কিয়ামত পর্যন্ত সকল মুমিনের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য। কোন যুগ সর্বশেষ তা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানেন না। হক্ক ও বাতিলের সংঘাত কিয়ামত পর্যন্তই চলবে। বাতিলের প্রাধান্য দেখে বিচলিত হয়ে বালিতে মুখ গোঁজার অনুমতি মুমিনকে দেওয়া হয়নি। নির্দিষ্ট কোন সময়ে আদেশ-নিষেধ ও দাওয়াতের এই দায়িত্ব রহিত হবে বলে জানানো হয়নি। সকল যুগেই সাধ্যমত সংশোধন ও পরিবর্তনের চেষ্টা মুমিনের উপর অর্পিত দায়িত্ব। শুধু একটি ক্ষেত্রে মুমিনের জন্য আদেশ, নিষেধ বা দাওয়াতের দায়িত্ব পালন ফরজ হবে না বলে আলেমগণ উল্লেখ করেছেন। তা হলো, নিশ্চিত ক্ষতি বা জুলুমের ভয়।
সূরা বাকারাহ-এর ১৯৫ আয়াতে এরশাদ করা হয়েছে,

❝ এবং তোমরা আল্লাহর পথে ব্যয় কর এবং তোমরা নিজেদেরকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করো না। (সূরা বাকারা : ১৯৫)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

❝ মুমিনের উচিত নয় নিজেকে অপমানিত করা। সাহাবিগণ বলেন, কিভাবে সে নিজেকে অপমানিত করবে? তিনি বলেন, নিজেকে এমন বিপদের মুখে ফেলবে যা সহ্য করার ক্ষমতা তার নেই।(তিরমিজি, ইবনে মাজাহ, আবু ইয়ালা, তাবরানী। সহীহ, মাজমাউল ফাওয়াইদ ৭/২৭২-২৭৫)

অন্য হাদিসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

❝ তোমরা ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধ করতে থাক। অবশেষে যখন দেখবে যে, সর্বত্র মানুষ জাগতিক লোভলালসার দাস হয়ে গিয়েছে, প্রত্যেকেই নিজ প্রবৃত্তির মর্জিমাফিক চলছে, দুনিয়াবি

স্বার্থ সর্বত্র প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে এবং প্রত্যেকেই তার নিজের মতকে সর্বোত্তম বলে বিশ্বাস করছে, তখন তুমি নিজের ব্যক্তিগত দায়িত্ব পালনে ব্যস্ত হবে এবং সাধারণ মানুষের বিষয় ছেড়ে দেবে। কারণ তোমাদের সামনে রয়েছে এমন কঠিন সময়, যখন ধৈর্য্য ধারন করাও আগুনের অঙ্গার মুঠি করে ধরার মত কষ্টদায়ক হবে। সে সময় যারা কর্ম করবে তারা তোমাদের মত যারা কর্ম করে তাদের ৫০ জনের সমান পুরুস্কার লাভ করবে। সাহাবিগণ বলেন, হে রাসুল (সা:), তাদের মধ্যকার ৫০ জনের সাওয়াব ? তিনি বলেন, না, বরং তোমাদের মধ্যকার ৫০ জনের সমপরিমাণ সাওয়াব। (তিরমিজি, আবু দাউদ, ইবনু মাজাহ, ইবনু হিব্বান, হাকিম। সহীহ।)

উপরের আয়াত ও হাদিসগুলির আলোকে আলিমগণ উল্লেখ করেছেন যে, মুমিন যদি নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারেন যে, আদেশ-নিষেধ বা দাওয়াতের দায়িত্ব পালন করতে গেলে জুলুম বা অপমানের শিকার হতে হবে, অথবা গৃহযুদ্ধ, পরস্পর হানাহানি ও চরম বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিতে তার কথা পরিস্থিতির আরো অবনতি ঘটাবে, তবে তিনি তা পরিত্যাগ করতে পারেন।

এ ক্ষেত্রে চারটি বিষয় লক্ষ্য রাখতে হবে:

- প্রথমত, উপরের হাদিসে আমরা দেখেছি যে, মানুষের ভয়ে হক্ক কথা বলা পরিত্যাগ করলে আল্লাহর নিকট জবাবদিহি করতে হবে। এজন্য সামান্য ভয় বা অনিশ্চিত আশঙ্কার কারণে এ দায়িত্ব পালনে অবহেলা করা ঠিক নয়।
- দ্বিতীয়ত, যদি মুমিন ক্ষতি বা অপমান সম্পর্কে নিশ্চিত হন তাহলে তাকে অবশ্যই সে স্থান পরিত্যাগ করা উচিত। আমরা উপরে কয়েকটি হাদিসে দেখেছি যে, যেখানে অন্যায় সংঘটিত হয় সেখানে বাধা দেওয়ার ক্ষমতা না থাকলে মুমিনের দায়িত্ব হলো অবিলম্বে সেস্থান পরিত্যাগ করা, নইলে তাকেও অভিশাপ ও গজবের অন্তর্ভুক্ত হতে হবে।
- তৃতীয়ত, সম্ভব হলে, বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি ও সমস্যার মধ্যেও সাধ্যমত এ দায়িত্ব পালন করতে হবে। কারণ এ পরিস্থিতিতে ভীতি ও ক্ষতির মধ্যেও যারা ধৈর্য্য ধারণ করে সাহাবিদের মত দাওয়াত ও আদেশ নিষেধের কাজ করতে পারবেন তাঁদের একজন ৫০ জন সাহাবির সমান সাওয়াব ও পুরুস্কার পাবেন।
- চতুর্থত, সর্বাবস্থায় অন্যায়ের প্রতি ঘৃণা ও অন্যায় অপসারণের জন্য হৃদয়ের আকুতি মুমিনের জন্য ফরজে আইন। অন্যায়কে মেনে নেওয়া, এমন তো হতেই পারে, বা ওদের কাজ ওরা করছে আমি কি করব, ইত্যাদি চিন্তা করে নির্বিকার থাকা বা অন্যায়ের প্রতি মনোকষ্ট অনুভব না করা ঈমান হারানোর লক্ষণ। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষার অবমাননা যে মুমিনকে পীড়া না দেয় তার ঈমানের দাবী অসার।

কঠোরতা, উগ্রতা বা সীমালঙ্ঘন

আমরা দেখেছি যে, দাওয়াত বা দীন প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে কঠোরতা বা উগ্রতা নিষিদ্ধ। মহান প্রভু যিনি মুমিনের উপর দাওয়াতের দায়িত্ব অর্পন করেছেন, তিনিই তাকে এ ক্ষেত্রে নম্রতার নির্দেশ দিয়েছেন। নামাজের জন্য তিনি পবিত্রতার নির্দেশ দিয়েছেন। কাজেই পবিত্রতা ছাড়া নামাজ আদায় করলে তাতে আল্লাহর ইবাদত হবে না, মনগড়া কাজ করা হবে। তেমনি দাওয়াতের ক্ষেত্রে নম্রতা ও উৎকৃষ্ট দিয়ে মন্দ প্রতিহত না করলে আল্লাহর ইবাদত করা হবে না, বরং প্রবৃত্তির অনুসরণ করা হবে। চরম উস্কানির মুখেও মুমিনকে ধৈর্য্য ধারন করতে হবে এবং উৎকৃষ্ট দিয়ে মন্দ প্রতিহত করতে হবে। যদি কেউ নিজের প্রবৃত্তির তাড়নায় রাগারাগি, কঠোরতা, উগ্রতা বা সীমালঙ্ঘনে লিপ্ত হন তবে তিনি নিজের প্রবৃত্তির চাহিদা মেটাবেন মাত্র, আল্লাহর ইবাদত করা হবে না। প্রতিটি মানুষকেই আল্লাহ ফিতরাত-এর উপর সৃষ্টি করেছেন এবং প্রত্যেকের মধ্যেই ভাল আছে। পরিবেশের ফলে অনেকের মধ্যে তা বীজ বা চারা রূপেই রয়ে গিয়েছে, পরিচর্যার অভাবে বৃক্ষ বা নিয়ন্ত্রক শক্তিতে রূপান্তরিত হতে পারেনি। সমাজের সবচেয়ে খারাপ মানুষটির মধ্যেও ভালর বীজ সুপ্ত রয়েছে। উগ্রতা, কঠোরতা, সমালোচনা বা গালাগালির বুলডোজার দিয়ে সে বীজ বা চারাকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করা দায়ীর কাজ নয়। দায়ীর দায়িত্ব হলো ভালবাসা, বিনম্রতা ও আন্তরিকতার পরিচর্যা দিয়ে মানুষের মধ্যকার কল্যাণমুখিতার বীজ বা চারাকে বৃক্ষে রূপান্তরিত করা।

ফলাফল প্রাপ্তির ব্যস্ততা

সঠিক জ্ঞানের অভাব ও আবেগের প্রভাবে আমরা যে সকল বিভ্রান্তির মধ্যে নিপতিত হতে পারি তার অন্যতম হলো, ফলাফল লাভের জন্য তাড়াহুড়া ও ব্যস্ততা বা ফলাফলের ভিত্তিতে দাওয়াতের সফলতা বিচার। দাওয়াত বা সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধের জন্য আমাদের মনে রাখতে হবে যে আমরা আল্লাহর দেওয়া দায়িত্ব পালন করছি, ফলাফল সন্ধান করছি না। অনেক সময় আবেগী মুমিনের মনে ফলাফল লাভের উন্মাদনা তাকে বিপথগামী করে ফেলে। আমরা চাই যে, সমাজ থেকে ইসলাম ও মানবতা বিরোধী সকল অন্যায় ও পাপ দূরীভূত হোক। কোন মুমিনের মনে হতে পারে যে, এত ওয়াজ, বক্তৃতা, বইপত্র, আদেশ-নিষেধ ইত্যাদিতে কিছুই হলো না, কাজেই তাড়াতাড়ি কিভাবে সব অন্যায় দূর করা যায় তার চিন্তা করতে হবে। এ চিন্তা তাকে অবৈধ বা ইসলামে অনুমোদিত নয় এমন কর্ম করে ইসলাম প্রতিষ্ঠার কুমন্ত্রণা দিতে পারে।

মহান আল্লাহ সূরা মায়িদার ১০৫ আয়াতে বলেছেন:

> হে মুমিনগণ, তোমাদের উপরে শুধু তোমাদের নিজেদেরই দায়িত্ব। তোমরা যদি সৎপথে পরিচালিত হও তা হলে যে পথভ্রষ্ট হয়েছে সে তোমাদের কোন ক্ষতি করবে না। (সূরা মায়েদা: ১০৫)

তাহলে আমাদের দায়িত্ব হল নিজেদের হেদায়েত। আর নিজের হিদায়েতের অংশ হলো দীনের প্রচার ও প্রসারের চেষ্টা। আমাদের আদেশ-নিষেধ সত্ত্বেও যদি কেউ বা সকলে বিপথগামী হয় তবে সেজন্য আমাদের কোনো পাপ হবে না বা আমাদেরকে আল্লাহর দরবারে দায়ী হতে হবে না। অনেক নবী শত শত বছর দাওয়াত ও আদেশ-নিষেধ করেছেন, কিন্তু অল্প কয়েকজন ছাড়া কেউ সুপথপ্রাপ্ত হয়নি। এতে তাঁদের মর্যাদায় কোনো কমতি হবে না বা তাঁদের দায়িত্ব পালনে কোনো কমতি হয়নি। কাজেই মুমিন কখনোই ফলাফলের জন্য ব্যস্ত হবেন না। বরং নিজের দায়িত্ব কোরআন ও হাদিসের আলোকে পালিত হচ্ছে কিনা সেটাই বিবেচনা করবেন।

বর্তমান যুগে দ্বীনের কাজে লিপ্ত মানুষেরাও জড়বাদী-বস্তুবাদী চিন্তা দ্বারা প্রভাবিত। আমরা আল্লাহর ইবাদতের সাফল্যও দুনিয়াবী ফলাফল দিয়ে বিচার করতে চাই। অথচ ইসলামের মূল শিক্ষাই হলো আখেরাতমুখিতা। দুনিয়াতে আল্লাহ কি ফলাফল দিবেন সেটা তাঁরই ইচ্ছা। মুমিনের চিন্তা হলো তার ইবাদত আল্লাহর কাছে কবুল হলো কিনা এবং সে আখেরাতে তার পুরুস্কার পাবে কিনা। মহান আল্লাহর দরবারে সকাতরে প্রার্থনা করি, তিনি দয়া করে আমাদেরকে দুনিয়ামুখিতা থেকে রক্ষা করেন এবং আমাদের হৃদয়গুলিকে আখেরাতমুখি করে দেন।

দাওয়াতের অজুহাতে ব্যক্তিগত আমলে ত্রুটি

সঠিক জ্ঞানের অভাব ও আবেগের প্রভাবে কেউ কেউ অন্যকে ভাল করার আশায় নিজে পাপে লিপ্ত হন বা নিজের নেককর্মে অবহেলা করেন। কখনো ফরজে আইন বাদ দিয়ে ফরজে কিফায়া পালন করেন। কখনো অন্যকে ভাল করার জন্য নিজে গুনাহ করেন এবং কখনো অন্যের ভালর আশায় নিজের ব্যক্তিগত নফল মুস্তাহাব আমলে অবহেলা করেন।

ফরজে আইন বাদ দিয়ে ফরজে কিফায়া পালন করা

আমরা দেখেছি যে, দাওয়াত, আদেশ, নিষেধ বা দীন প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব মুসলিম উম্মাহর সামগ্রিক দায়িত্ব ও ফরজে কিফায়া। প্রত্যেক জনগোষ্ঠীর সংশ্লিষ্ট কিছু মানুষ এ দায়িত্ব পালন করলে বাকীদের জন্য তা নফলে পরিণত হয়। যিনি এ দায়িত্ব পালন করবেন তিনি এর মহান সাওয়াব ও মর্যাদা অর্জন করবেন। কিন্তু অন্যদের কোনো গুনাহ হবে না। পক্ষান্তরে, পিতামাতার খেদমত, স্ত্রী-সন্তানদের ভরণপোষণ, তাদের পূর্ণ মুসলিমরূপে প্রতিপালন, কর্মস্থলের চুক্তি পালন ইত্যাদি মুসলিমের জন্য ফরজে আইন। দাওয়াতের অগণিত সাওয়াব ও ফজিলতের কথা শুনে বা বিশ্বে ইসলামকে বিজয়ী করার আবেগে যদি আমরা আমাদের ফরজে আইন ইবাদতগুলিতে অবহেলা করে ফরজে কিফায়া বা নফল পর্যায়ের দাওয়াত, আদেশ বা নিষেধে রত হই তাহলে তা আমাদের ধ্বংস ও ক্ষতির পথ প্রশস্ত করবে।

ওয়াজিব-সুন্নাত বর্জন করা বা হারাম-মাকরূহে লিপ্ত হওয়া

নিজের ব্যক্তিগত দায়িত্ব ও অপরের প্রতি আমার দায়িত্বের মধ্যে পার্থক্য বুঝা আমাদের জন্য জরুরি। অনেক সময় দ্রুত ফলাফল লাভের চিন্তা মুমিনকে অন্যের ভাল করার প্রচেষ্টায় নিজে অন্যায় করতে প্ররোচিত করে। যেমন একজন মদ খাচ্ছেন। তাকে দাওয়াত দেওয়ার জন্য আমি তার সাথে বসে কিছু মদ পান করি। অথবা একজন বেপর্দা মহিলাকে দাওয়াত দেওয়ার জন্য আমিও নিজের পর্দা নষ্ট করি। এভাবে দাওয়াতের নামে সিনেমা ইত্যাদি দেখা, জামাতে নামাজ নষ্ট করা, দাড়ি কাটা বা অন্য কোন শরিয়ত নিষিদ্ধ বা আইন বিরুদ্ধ কাজ করা সবই এ পর্যায়ের। অনেক সময় শয়তানি প্ররোচনায় মুমিন এগুলিকে দাওয়াতের ক্ষেত্রে হিকমত ও প্রজ্ঞা বলে মনে করতে পারেন। আসলে বিষয়টি বিভ্রান্তি। হিকমতের অর্থ দাওয়াত গ্রহণকারীর মানসিক প্রস্তুতির আলোকে শরিয়ত অনুসারে দাওয়াত প্রদান। নিজে পাপে লিপ্ত হওয়া বা নিজের নেক আমল নষ্ট করা কখনোই হিকমত নয়, বরং নফসানিয়্যাত ও প্রবৃত্তির অনুসরণ।

ব্যক্তিগত নফল-মুস্তাহাব ইবাদতে ত্রুটি করা

অনেক সময় আবেগের বশবর্তী হয়ে মুমিন দাওয়াত বা আদেশ নিষেধের জন্য তাহাজ্জুদ, জিকর, তিলাওয়াত ও অন্যান্য সুন্নাত-মুস্তাহাব ইবাদত পালনে ত্রুটি করেন। মুমিনের মনে হতে পারে, আগে দাওয়াত, আদেশ-নিষেধ ইত্যাদির মাধ্যমে দ্বীনের বিজয় ও তা প্রতিষ্ঠিত করে এরপর আমি আমার ব্যক্তিগত তাকওয়া, সুন্নাত, তাহাজ্জুদ, জিকর, তাজকিয়া ইত্যাদি বিষয়ে নজর দিব। অথবা আমি তো সবচেয়ে বড় কাজে লিপ্ত রয়েছি কাজেই অন্য নেক আমল না করলেও চলে। বিষয়টি ওয়াসওয়াসা এবং ভুল বুঝা ছাড়া কিছুই নয়।

এখানে নিম্নের বিষয়গুলির প্রতি লক্ষ্য রাখা দরকার:

- প্রথমত, ফরজে আইন ইবাদতে ত্রুটি করে ফরজে কিফায়া বা নফল ইবাদত বৈধ নয়। এজন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পিতামাতার খেদমত ত্যাগ করে আল্লাহর পথে জিহাদে শরিক হতে অনুমতি দেননি, যদিও জিহাদের ফজিলত অকল্পনীয়।
- দ্বিতীয়ত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মহান সাহাবিগণের জীবনে আমরা দেখতে পাই যে, দ্বীনের দাওয়াত ও প্রতিষ্ঠার কারণে তারা ব্যক্তিগত তাজকিয়া. নফল ইবাদত, তাহাজ্জুদ, জিকর, ক্রন্দন ইত্যাদির সামান্যতম কমতি করেননি।
- তৃতীয়ত, দ্বীনের দাওয়াত ও প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ফাইনাল পর্যায় বলে কিছু নেই। এটি একটি স্থায়ী ও চলমান প্রক্রিয়া। হক ও বাতিলের সংঘাত কিয়ামত পর্যন্ত চলবে। বিজয়ের চাকা এদিকে ওদিকে ঘুরবে। কাজেই একটি নির্দিষ্ট সময়ে আমার দাওয়াত ও দ্বীন প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব থেমে

যাবে এবং আমি অন্য কাজে মনোযোগ দিতে পারব, এরূপ চিন্তা ওয়াসওয়াসা ও বিভ্রান্তি মাত্র।

- চতুর্থত, অগণিত নবী-রাসূল, মুজাহিদ ও দায়ী ইলাল্লাহ, তাঁদের আজীবন কর্ম করেও জাগতিক ফলাফল দেখে যাননি। তাঁরা কখনই উপরের ওয়াসওয়াসার প্রভাবে নিজেদের ব্যক্তিগত ফরজ দায়িত্ব বা ব্যক্তিগত জীবনে আল্লাহর সাথে গভীর সম্পর্ক ও তাজকিয়ার বিষয়ে ত্রুটি করেননি।
- পঞ্চমত, মুমিনের কাজ দুইটি। আল্লাহর সাথে নিজের সম্পর্ক গভীর করা ও অন্য মানুষদেরকে দাওয়াত ও আদেশ-নিষেধের মাধ্যমে এই পথে আহ্বান করা। প্রথম কাজটির গুরুত্ব দ্বিতীয় কাজটির চেয়ে অনেক বেশি। কারণ প্রথম কাজে বান্দা নিজের ইচ্ছায় এগোতে পারে। দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজের ফলাফল বান্দার নিজের ইচ্ছার মধ্যে নয়। কাজেই কেউ যদি দ্বিতীয় কর্মের ফলাফল লাভের উপর প্রথম কর্ম বন্ধ করে রাখেন তাহলে তার আখিরাতের জীবনকে ক্ষতিগ্রস্থ করা ছাড়া আর কিছুই হবে না। আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর সন্তুষ্টির পথে চলার তওফিক দান করুন।

দাওয়াত ও সংশোধন বনাম বিচার ও শাস্তি

সঠিক জ্ঞানের অভাবে ও আবেগের প্রভাবে যে কঠিন ভুল ঘটে যেতে পারে তা হলো আদেশ নিষেধের নামে বিচার-শাস্তি প্রদান। আদেশ-নিষেধ ও বিচার-শাস্তির মধ্যে পার্থক্য অনুধাবন করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ক্ষমতা অনুসারে অন্যায় পরিবর্তন বা বন্ধ করা মুমিনের দায়িত্ব। কিন্তু অন্যায় বন্ধ করা এবং অন্যায়ের বিচার ও শাস্তি দেওয়া সম্পূর্ণ দুইটি পৃথক দায়িত্ব। প্রথমটি সকল মুসলিমের করণীয়। আর বিচার ও শাস্তি একমাত্র রাষ্ট্রের অধিকার ও দায়িত্ব। রাষ্ট্র যেন তার উপর অর্পিত সঠিক বিচার-শাস্তি প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব পালন করে সে জন্য মুমিন যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন। কিন্তু কোনো অবস্থাতেই মুমিনকে বিচার নিজ হাতে তুলে নেওয়ার অধিকার দেওয়া হয়নি। এজন্য ইমাম আহমদ রহ. বলেছেন,

> “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্যায়ের পরিবর্তন হাত দিয়ে করতে বলেছেন, তরবারী বা অস্ত্র দিয়ে নয়। (আল-কানযুল আকবর ১/৭৮)

অতীত বা ভবিষ্যৎ অন্যায় বা অসৎ কাজের জন্য ওয়াজ নসিহত বা উপদেশ দিতে হবে। আর বর্তমানে কাউকে অন্যায়ে লিপ্ত দেখতে পেলে সম্ভব হলে তাকে বিরত করতে হবে কিন্তু কোনো অবস্থাতেই বিচারের দায়িত্ব হাতে তুলে নেওয়া যাবে না। নিম্নের উদাহরণ থেকে আমরা তা বুঝতে পারব।

মদপান বা মাদক দ্রব্য গ্রহণ একটি কঠিন পাপ ও অন্যায়। ইসলামি শরিয়তে এর শাস্তি বেত্রাঘাত। যদি কোনো মুমিন কোথাও কাউকে মদপান বা নেশাগ্রহণ করতে দেখেন তাহলে তার দায়িত্ব হলো তা বন্ধ করার চেষ্টা করা। তিনি সম্ভব হলে তাকে শক্তি দিয়ে একাজ থেকে বিরত করবেন। না হলে তাকে বিরত হতে উপদেশ দিবেন। না হলে অন্তর দিয়ে ঘৃণা করবেন এবং এই পাপ বন্ধ হোক তা কামনা করবেন। কিন্তু কোনো অবস্থাতেই তিনি মদপানকারীর বিচার করতে পারবেন না বা শরিয়ত নির্ধারিত শাস্তি দিতে পারবেন না।

অনুরূপভাবে ব্যভিচার, ধর্মত্যাগ, খুন, চুরি ইত্যাদি কঠিন পাপ। ইসলামে এগুলির শাস্তি বেত্রাঘাত, মৃত্যুদণ্ড বা হস্তকর্তন। কোনো মুমিন কাউকে এসকল পাপে লিপ্ত দেখতে পেলে তিনি উপর্যুক্ত পদ্ধতিতে তা বন্ধ করার চেষ্টা করবেন। কিন্তু তিনি কোনো অবস্থাতেই তার বিচার বা শাস্তি প্রদান করতে পারবেন না। বিচার ও শাস্তির জন্য ইসলামে নির্ধারিত প্রক্রিয়া রয়েছে। সাক্ষ্য, প্রমাণ, আত্মপক্ষ সমর্থন ইত্যাদি প্রক্রিয়ার বাইরে শাস্তি দেওয়ার অধিকার রাষ্ট্রপ্রধান বা বিচারকেরও নেই।

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু আব্দুর রহমান ইবনু আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলেন, আপনি শাসক থাকা অবস্থায় যদি কাউকে ব্যভিচার বা চুরির অপরাধে রত দেখতে পান তাহলে তার বিচার বিধান কি? (নিজের দেখাতেই কি বিচার করতে পারবেন?) আব্দুর রহমান রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আপনার সাক্ষ্যও একজন সাধারণ মুসলিমের সাক্ষ্যের সমান। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আপনি ঠিকই বলেছেন। (সহিহ বুখারি) অর্থাৎ স্বয়ং রাষ্ট্রপ্রধানও নিজের দেখার ভিত্তিতে বিচার করতে পাবেন না এবং তাঁর একার সাক্ষ্যেও বিচার হবে না।

অন্য এক ঘটনায় উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু রাত্রে মদিনায় ঘোরাফেরা করার সময় একব্যক্তিকে ব্যভিচারে লিপ্ত দেখতে পান। তিনি পরদিন সকালে সাহাবিগণকে জিজ্ঞাসা করেন, যদি রাষ্ট্রপ্রধান কাউকে ব্যভিচারে লিপ্ত দেখতে পান তাহলে তিনি কি শাস্তি প্রদান করতে পারবেন? তখন আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, কখনোই না। আপনি ছাড়া আরো তিনজন প্রতক্ষ্যদর্শী সাক্ষী যদি অপরাধের সাক্ষ্য না দেয় তাহলে আপনার উপরে মিথ্যা আপবাদের শাস্তি প্রয়োগ করা হবে। (আল-কানযুল আকবর ১/২২৭)

এখানে আরো একটি বিষয় লক্ষনীয়, তা হলো দেখা ও শোনার মধ্যে পার্থক্য। কোনো অন্যায় সংঘটিত হতে দেখলে সাধ্যমত তা পরিবর্তন বা প্রতিবাদ-প্রতিকার করতে হবে। কিন্তু যদি কোথাও অন্যায় হচ্ছে শুনে সেখানে যেয়ে দেখা গেল যে অন্যায় সংঘটিত হয়ে গিয়েছে। এখন আর কেউ তাতে লিপ্ত নেই। এই অবস্থায় বিষয়টি বিচার্য বিষয়ে পরিণত হবে। এক্ষেত্রে কোনো মানুষ কোনো অবস্থাতেই অমুক কিছুক্ষণ আগে অমুক অপরাধে লিপ্ত ছিল, বলে তাকে বিচার করতে পারবেন না বা

শাস্তি দিতে পারবেন না। প্রয়োজন ও সুযোগ অনুসারে উপদেশ নসিহত করবেন বা আইনে সোপর্দ করবেন।

অনেক সময় সঠিক বিচার হবে না, বা শরিয়ত সম্মত বিচার হবে না এ চিন্তা কাউকে বিচার হাতে তুলে নেওয়ার জন্য প্ররোচিত করতে পারে। এক্ষেত্রে আমাদের আবারো মনে রাখতে হবে যে, আমাদের দায়িত্ব হলো, আদেশ, নিষেধ ও আহ্বান। বিচার করা বা সকল অন্যায় মিটিয়ে দেওয়া আমাদের দায়িত্ব নয়। সঠিক বিচার বা ইসলাম সম্মত বিচার না থাকলে তা প্রতিষ্ঠার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে সাধ্যমত আদেশ-নিষেধ করা বা তা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা আমাদের দায়িত্ব। কিন্তু কোনো অবস্থাতেই বিচার হাতে তুলে নেওয়ার কোনো অধিকার আল্লাহ ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে দেননি। দাওয়াতের পরেও যদি সঠিক বিচার না হয় বা শরিয়ত বিরোধী বিচার হয় তবে সেজন্য সংশ্লিষ্টরা আল্লাহর নিকট অপরাধী হবেন এবং দায়ীগণ বিমুক্ত থাকবেন। সঠিক বিচার হবে না মনে করে গণপিটনি, ভাংচুর বা আইন হাতে তুলে নেওয়া কঠিন অন্যায় ও হারামসমূহের অন্যতম। লোকটি সত্যিকার অপরাধী কিনা, কতটুকু অপরাধী এবং এই অপরাধে ইসলামে তার শাস্তি কি, তা নির্ধারণ করার জন্য শরিয়তের সঠিক প্রক্রিয়ার বাইরে কিছু করার অর্থই হলো জুলুম। আর পূর্বের হাদিসে আমরা দেখেছি যে, এতে অংশগ্রহণ তো দূরের কথা, এখেনে উপস্থিত থাকলেও লা'নতের ভাগী হতে হবে।

আদেশ-নিষেধ বনাম গীবত-অনুসন্ধান

কোরআন হাদিসের জ্ঞানের অভাবে ও আবেগের প্রভাবে আমরা আরেকটি ভুল করি। আমরা আদেশ-নিষেধের নামে পরচর্চা ও দোষ খোঁজায় লিপ্ত হই। আদেশ-নিষেধ এবং পরনিন্দা ও গোপন দোষ অনুসন্ধানের মধ্যে পার্থক্য আসমান ও জমিনের। প্রথমটি ফরজ ইবাদত আর দ্বিতীয়টি হারাম, কবীরা গুনাহ।

মহান আল্লাহ যেমন অসৎ ও অন্যায় কাজ থেকে নিষেধ করতে নির্দেশ দিয়েছেন, তেমনি তিনি অন্যের গোপন অন্যায় বা দোষ খোঁজ করতেও নিষেধ করেছেন। যে অন্যায় প্রকাশ্যে দেখতে পাবেন, আপনি প্রকাশ্যে তার প্রতিবাদ-প্রতিকার করবেন। আপনি যে অন্যায় কাজটি দেখতে পেয়েছেন তা যদি অন্যেরা না দেখে তাহলে আপনি অন্যায়কারীকে ভয় প্রদর্শন বা আদেশ-নিষেধের মাধ্যমে সংশোধনের চেষ্টা করবেন। একান্ত বাধ্য না হলে বা মানবাধিকার তথা হক্কুল ইবাদ সংশ্লিষ্ট না হলে বিষয়টি আইন বা জনসম্মুখে তুলবেন না।

কারো দোষ গোপনে অনুসন্ধান করা বা গোপন দোষ জানার চেষ্টা করা হারাম। অনুরূপভাবে কারো কোনো গোপন অন্যায় বা দোষের কথা জানলে তা প্রকাশ না করে গোপন রাখা এবং গোপনেই তাকে

নসিহত করা হাদিসের নির্দেশ। সর্বোপরি কারো দোষের কথা তার অনুপস্থিতিতে আলোচনা করা গীবত বা পরচর্চা এবং তা কঠিনতম হারাম কাজ। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, কারো অন্যায়ের কথা মানুষের কাছে বলে বেড়ানোর নাম সৎকাজে আদেশ বা অসৎকাজে নিষেধ করা নয়। বরং এই কাজটিই একটি অসৎকাজ। আল্লাহ তায়ালা সূরা হুজরাতের ১২ আয়াতে বলেছেন,

❝ হে মুমিনগণ তোমরা অধিক অনুমান থেকে দূরে থাক। নিশ্চয় কোনো কোনো অনুমান তো পাপ। আর তোমরা গোপন বিষয় অনুসন্ধান করো না এবং একে অপরের গীবত করো না। তোমাদের মধ্যে কি কেউ তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে পছন্দ করবে? তোমরা তো তা অপছন্দই করে থাক। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ অধিক তাওবা কবুলকারী, অসীম দয়ালু। (সূরা হুজুরাত : ১২)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

❝ খবরদার! তোমরা অবশ্যই অনুমান থেকে দূরে থাকবে। কারণ অনুমাণই হলো সবচেয়ে বড় মিথ্যা। এবং তোমরা একে অপরের গোপনীয় বিষয় জানার চেষ্টা করবে না।, গোপন দোষ অনুসন্ধান করবে না, পরস্পর হিংসা করবে না, পরস্পরে বিদ্বেষে লিপ্ত হবে না এবং পরস্পরে শত্রুতা ও সম্পর্কচ্ছেদ করবে না। তোমরা পরস্পরে আল্লাহর বান্দা ভাই ভাই হয়ে যাও। (বুখারি ও মুসলিম।)

এভাবে আমরা জানতে পারছি যে, অনুমানে কথা বলা এবং অন্যের দোষ অনুসন্ধান করা হারাম। শুধু তাই নয়, অনুসন্ধান ছাড়াও যদি অন্যের কোনো দোষত্রুটি মানুষ জানতে পারে তা তার অনুপস্থিতিতে উল্লেখ করা গীবত ও হারাম। গীবত হলো ১০০% সত্য কথা। কোনো ব্যক্তির ১০০% সত্য দোষত্রুটির কথা তার অনুপস্থিতিতে উল্লেখ করার নামই গীবত। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

❝ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা কি জান গীবত বা অনুপস্থিতের নিন্দা কী? সাহাবিগণ বললেন, আল্লাহ ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই ভাল জানেন। তিনি বলেন, তোমার ভাইকে তার অনুপস্থিতিতে এমনভাবে উল্লেখ করা যা সে অপছন্দ করে। তখন প্রশ্ন করা হলো, বলুন তো আমি যা বলছি তা যদি সত্যই আমার ভাইয়ের মধ্যে বিরাজমান হয় তাহলে কি হবে? তিনি বললেন, তুমি যা বলছ তা যদি তার মধ্যে বিরাজমান থাকে তাহলে তুমি তার গীবত করলে। আর যদি তা তার মধ্যে না থাকে তাহলে তুমি তার মিথ্যা অপবাদ করলে। (মুসলিম)।

আমরা ভাবি, সত্য কথা বলব তাতে অসুবিধা কি? আমরা হয়ত বুঝি না বা প্রবৃত্তির কুমন্ত্রনায় বুঝতে চাই না যে, সব সত্য কথা জায়েয নয়। অনেক সত্য কথা মিথ্যার মত বা মিথ্যার চেয়েও বেশি হারাম।

আবার কখনও বলি, আমি এ কথা তার সামনেও বলতে পারি। আরে সামনে যা বলতে পারেন তা পিছনে বলাই তো গীবত।

গীবত অর্থাৎ অন্যের দোষত্রুটি তার অনুপস্থিতিতে আলোচনা করা অত্যন্ত আনন্দদায়ক কর্ম। মানবীয় প্রবৃত্তি তা খুবই পছন্দ করে। কোরআনে এ জন্য একে গোশত খাওয়ার সাথে তুলনা করা হয়েছে। গোশত খাওয়া খুবই মজাদার, তবে নিজ মৃতভাইয়ের গোশত খাওয়া মজাদার নয়, ঘৃণ্য কাজ। কোরআনের নির্দেশনা যার হৃদয়ের গভীরে প্রবেশ করেছে সেই মুমিন অনুভাব করেন যে গীবতের মাধ্যমে তিনি মৃতভাইয়ের গোশত ভক্ষণ করছেন। এজন্য কাজটি তাঁর কাছে অত্যন্ত ঘৃণ্য। কিন্তু আমরা দুর্বল ঈমানের অধিকারীরা তা বুঝতে পারি না। বরং ভুনা গরুর গোশতের মতই পরিতৃপ্তির সাথে আমরা তা ভক্ষণ করি।

মানব প্রবৃত্তির কাছে গীবতের মজাদার হওয়ার দুইটি কারণ।

- প্রথমত, নিজের দোষের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া বিরক্তিকর। অন্যের দোষ আলোচনা করলে এ বিরোক্তি থেকে বাঁচা যায়।
- দ্বিতীয়ত, নিজের ভালত্ব, ও প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার সহজ উপায় গীবত। নিজের বড়ত্ব নিজে বলা একটু খারাপ দেখায়। অন্যদের গীবতের মাধ্যমে সহজেই প্রমাণ করা যায় যে, সকলেই দোষযুক্ত, আমি অনেক ভাল।

মানবীয় দুর্বলাতার বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

❝ তোমাদের মধ্যে একজন মানুষ নিজ ভাইয়ের চোখের সামান্য কুটা টুকু দেখতে পায়, কিন্তু নিজের চোখের মধ্যে বিশাল বৃক্ষের কথা ভুলে যায়।(সেহিহ ইবনে হিব্বান, মাওয়ারিদুয যামআন ৬/৯০, হাদিসটি সহিহ)।

গীবতের নিন্দায় এবং এর কঠোরতম শাস্তির বর্ণনায় অনেক হাদিস বর্ণিত হয়েছে। এখানে সেগুলির বিস্তারিত আলোচনা সম্ভব নয়। আমরা দাওয়াত কেন্দ্রিক ঘৃণ্য গীবত ও গীবতের কারণগুলি বুঝতে চাই। আমাদের সমাজে দাওয়াতে লিপ্ত সম্মানিত মুমিনগণকে শয়তান বিভিন্নভাবে গীবতে লিপ্ত করে। তন্মধ্যে প্রধান পথ দুইটি:

- ১. পাপে বা অন্যায়ে লিপ্তগণের গীবত। এবং
- ২. দাওয়াতে লিপ্ত অন্য মুসলিমের গীবত।

পাপীর গীবত

দাওয়াতে লিপ্ত মুমিন স্বভাবতই পাপে লিপ্ত মানুষদেরকে অপছন্দ করেন। এদের মধ্যে অনেকেই ক্ষমতাধর বা তাদের সামনে কিছু বলার সুযোগ তিনি পান না। এজন্য এদের অনুপস্থিতিতে সুযোগ পেলেই এদের বিভিন্ন দোষ বা অপরাধ আলোচনা করেন। তিনি মনে করেন, এভাবে তিনি পাপের প্রতি তাঁর ঘৃণা প্রকাশ করছেন। অথচ প্রকৃতপক্ষে তিনি গীবত ও অপরাধের মাধ্যমে হারামে লিপ্ত হচ্ছেন এবং নিজের আমল ধ্বংস করছেন। অমুক কর্ম পাপ এবং আমি তা ঘৃণা করি। যারা এতে লিপ্ত সবাই ঘৃণ্য কাজে লিপ্ত, একথা বললে পাপের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ হতে পারে। কিন্তু অমুক ব্যক্তি অমুক পাপে লিপ্ত, একথা তার অনুপস্থিতিতে বললে সন্দেহাতীতভাবে গীবত হবে।

এই হারামকে হালাল করার জন্য একটি বানোয়াট হাদিস বলা হয়:

❝ পাপীর গীবত নেই। অর্থাৎ পাপীর দোষ পিছনে আলোচনা করলে গীবত হয় না। হাদিসটি বানোয়াট বা অত্যন্ত দুর্বল। (মুখতাসারুল মাকাসিদ, ১৬৪ পৃ: জয়ীফুল জামে, ৭০৯ পৃ)।

এখানে নিম্নের বিষয়গুলি লক্ষনীয়:

- প্রথমত, পাপীর গীবত না হলে দুনিয়াতে গীবত বলে কিছু থাকে না। আমরা সকলেই পাপী। কিছু না কিছু পাপে আমরা সকলেই জড়িত। আর গীবত তো সত্য দোষ বলা। এজন্য নিষ্পাপ মানুষের তো গীবত হবে না, অপবাদ হবে। কোরআন ও হাদিসের অসংখ্য নির্দেশনা থেকে আমরা নিশ্চিত জানি যে, যে কোনো পাপীর যে কোনো প্রকারের দোষত্রুটি, যা তার অনুপস্থিতিতে আলোচিত হয়েছে জানলে তার খারাপ লাগে, তা তার অনুপস্থিতিতে আলোচনা করাই গীবত।
- দ্বিতীয়ত, কোনো ব্যক্তির দোষত্রুটির কথা তার অনুপস্থিতিতে বলার একটিই শরিয়ত সম্মত কারণ আছে, তা হলো, অন্য কাউকে অধিকতর ক্ষতি থেকে রক্ষা করা। এক্ষেত্রেও মুমিনকে বুঝতে হবে যে, একাজটি একটি ঘৃণিত কাজ। একান্তই বাধ্য হয়ে তিনি তা করছেন। কাজেই প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছুই না বলা।
- তৃতীয়ত, গীবত কোরআন ও হাদিসের মাধ্যমে হারাম করা হয়েছে। কোরআন-হাদিসে স্পষ্টভাবে গীবতকে কোনো অবস্থাতেই হালাল বলা হয়নি। শুধু কোনো মানুষ বা জনগোষ্ঠীকে নিশ্চিত ক্ষতি থেকে রক্ষা করার একান্ত প্রয়োজনে তা বৈধ হতে পারে বলে আলেমগণ মত প্রকাশ করেছেন। এখন মুমিনের কাজ হল কোরআন ও হাদিস যা নিষেধ করেছে তা ঘৃণাভরে পরিহার করা। এমনকি সে কর্মটি কখনো জায়েয হলেও তিনি তা সর্বদা পরিহার করার চেষ্টা করবেন। শুকরের মাংস, মদ, রক্ত ইত্যাদি আল্লাহ হারাম করেছেন এবং প্রয়োজনে জায়েয বলে ঘোষণা করেছেন। এখন মুমিনের দায়িত্ব কি? বিভিন্ন অজুহাতে প্রয়োজন দেখিয়ে এগুলি ভক্ষণ করা? না যত কষ্ট বা প্রয়োজনই হোক তা পরিহার করার চেষ্টা করা?গীবত ও ঠিক

অনুরূপ একটি হারাম কর্ম যা একান্ত প্রয়োজনে বৈধ হতে পারে।গীবত ও শুকরের মাংসের মধ্যে দুইটি পার্থক্য।প্রথম পার্থক্য হলো শুকরের মাংস যে প্রয়োজনে খাওয়া যেতে পারে তা কোরআনেই বলা হয়েছে , পক্ষান্তরে গীবতের ক্ষেত্রে অনুরূপ কিছু কোরআন বা সহিহ হাদিসে বলা হয়নি। দ্বিতীয় পার্থক্য হলো, সাধারণভাবে শুকরের মাংস ভক্ষণ করা শুধুমাত্র আল্লাহর হক জনিত পাপ। সহজেই তাওবার মাধ্যমে তা ক্ষমা হতে পারে। পক্ষান্তরে গীবত বান্দার হক জনিত পাপ। এর ক্ষমার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ক্ষমা প্রয়োজন। এজন্য মুমিনের দায়িত্ব হলো বিভিন্ন অজুহাতে বা জয়ীফ-মওজু হাদিসের বরাত দিয়ে এ পাপে লিপ্ত না হয়ে যথাসাধ্য একে বর্জন করা।

- চতুর্থত, আল্লাহর পথে আহবানকারীর দায়িত্ব হলো যথাসাধ্য পরিবর্তন ও সংশোধন। গীবতের মাধ্যমে কখনোই কোনো পাপের পরিবর্তন বা সংশোধন হয়নি বা হয় না। এতে শুধুমাত্র নিজের পাপ বৃদ্ধি পায়।

দায়ীর গীবত

দায়ীগণ কখনো কখনো একে অন্যের গীবতে লিপ্ত হয়ে পড়েন। দ্বীনের দাওয়াতে রত মুসলিমগণ এখন বিভিন্ন দলে বিভক্ত। দীন পালনের মাধ্যম হিসাবেই আমরা দল করি। এ সকল দলের মধ্যে বিভিন্ন মতপার্থক্য রয়েছে। পার্থক্যের অনেক বিষয় পদ্ধতিগত ও ইজতিহাদ কেন্দ্রিক। কিছু বিষয় কোরআন ও হাদিসের দৃষ্টিতেই অন্যায় ও আপত্তিকর। প্রথম ক্ষেত্রে মতভেত মেনে নেওয়া প্রয়োজন। দ্বিতীয় ক্ষত্রে ভুলগুলি সংশোধনের জন্য উপরে বর্ণিত দাওয়াতের নিয়মাবলী অনুসারে তাদেরকে আদেশ, নিষেধ ও দাওয়াত করতে হবে।

কিন্তু দু:খজনক হলো যে, এগুলির পরিবর্তে আমরা একদলের কয়েকজন একত্রিত হলে বা কোনো সুযোগ পেলে অন্য দলের বিভিন্ন মানুষের ব্যক্তিগত, গোষ্ঠীগত বা মতামতগত ভুলত্রুটি আলোচনা করে গীবতে রত থাকি। এতে কোনো মানুষ সংশোধিত হয় না বা দ্বীনের কোনো উপকার হয় না। এ জাতীয় গীবত থেকে আমরা কয়েকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হই,

- প্রথমত, কঠিন হারাম কর্ম করে নিজের আখেরাত নষ্ট করি।
- দ্বিতীয়ত, গীবতে ব্যস্ত থাকার ফলে আল্লাহর জিকর ও নিজের ভুলত্রুটি স্মরণ করে তাওবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হই।
- তৃতীয়ত, অন্যের ভুলত্রুটি আলোচনা করার মাধ্যমে নিজেদের মনে আত্মতৃপ্তি ও অহঙ্কার আসে, যা মুমিনের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকারক।
- চতুর্থত, বিভিন্ন হাদিস থেকে আমরা জানতে পারি যে, কিয়ামতের দিন গীবতকারীর সাওয়াব গীবতকৃত ব্যক্তিকে প্রদান করা হবে এবং গীবতকৃতর পাপ বা ভুলত্রুটির কারণে যে সকল

মানুষদের আমরা অপছন্দ করি, প্রকৃতপক্ষে আমাদের কষ্টার্জিত সাওয়াব তাদেরকে দান করছি এবং তাদের পাপগুলি আমরা গ্রহণ করছি।

সংশোধন বনাম দোষ গোপন

অন্যের দোষ যেমন তার অনুপস্থিতে বলতে নিষেধ করা হয়েছে, অপরদিকে তা গোপন করতে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

❝ মুসলিম মুসলিমের ভাই। একজন আর একজনকে জুলুম করে না এবং বিপদে পরিত্যাগ করে না। যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের প্রয়োজন মিটাতে ব্যস্ত থাকবে আল্লাহ তার প্রয়োজন মিটাতে থাকবেন। যে ব্যক্তি কোনো মুসলিমের কষ্ট-বিপদ দূর করবে আল্লাহ কেয়ামতের দিন তার বিপদ দূর করবেন। যে ব্যক্তি কোনো মুসলিমের দোষ গোপন করবে আল্লাহ কেয়ামতের দিন তার দোষ গোপন করবেন। (বুখারি ও মুসলিম)।

মিশরের গর্ভনর সাহাবি উকবা ইবনু আমির রাদিয়াল্লাহু আনহুর সেক্রেটারী আবুল হাইসাম দুখাইন বলেন, আমি উকবা রা. কে বললাম, আমাদের কয়েকজন প্রতিবেশী মদপান করছে। আমি এখুনি যেয়ে পুলিশ ডাকছি যেন তাদের ধরে নিয়ে যায়। উকবা বলেন, তুমি তা করো না। বরং তুমি তাদেরকে উপদেশ দাও এবং ভয় দেখাও।....আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি,

❝ যে ব্যক্তি কোনো মুমিনের দোষ গোপন করল সে যেন কোনো জীবন্ত প্রথিত নারীকে তার কবরে জীবিত করে দিল। (সহিহ ইবনে হিব্বান)

উপরের হাদিসগুলির আলোকে আমরা বুঝতে পারছি যে মুমিন আল্লাহর পথে আহবান করবেন। কোনো অন্যায় দেখলে তা সংশোধনের চেষ্টা করবেন। কিন্তু কখনোই মুমিন অন্যের গোপন দোষ অনুসন্ধান করবেন না। কারো কোনো দোষ জানতে পারলে তা গোপন রাখবেন। সাধ্যমত গোপনেই তা সংশোধনের চেষ্টা করবেন। তিনি কারো গোপন দোষ অন্যের সামনে প্রকাশ করবেন না। সংশোধনের প্রয়োজনে একান্ত বাধ্য হলে শুধুমাত্র যাকে বললে সংশোধন হবে তাকেই বলবেন। কারো অনুপস্থিতিতে তার দোষ তিনি আলোচনা করবেন না। মুমিনের দায়িত্ব হল মানুষকে ভালপথে আনতে চেষ্টা করা। অহেতুক অন্যের দোষ আলোচনা করে আত্মতৃপ্তি লাভ ও পাপ অর্জন মুমিনের দায়িত্ব নয়। আল্লাহ আমাদেরকে রক্ষা করুন।

ইবাদত পালনে সুন্নাতের গুরুত্ব:সুন্নাতের অর্থ ও পরিচয়

সুন্নাত শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো: মুখ, ছবি, প্রতিচ্ছবি, প্রকৃতি, জীবন-পদ্ধতি, কর্মধারা ইত্যাদি।

সাধারণভাবে সুন্নাত বলতে আমরা বুঝি ফরজ ও ওয়াজিবের পরবর্তী পর্যায়ের নেককর্ম যা করা অত্যাবশ্যকীয় নয়, তবে উচিত, উত্তম ও প্রয়োজনীয়। তবে হাদিস শরিফে এবং সাহাবি তাবেয়ীনগণের পরিভাষায় সুন্নাত বলতে বুঝানো হয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সকল প্রকারের নির্দেশ, কথা, কর্ম, অনুমোদন বা এক কথায় তাঁর সামগ্রিক জীবনার্দশ। এ ছাড়া তাঁর সাহাবিদের কর্ম ও আদর্শও এই অর্থে সুন্নাত বলে অভিহিত হয়।

সুন্নাতের অর্থ ও পরিচয় সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করার চেষ্টা করেছি এহইয়াউস সুনান গ্রন্থে। এ পুস্তিকার সংক্ষিপ্ত পরিসরে আমরা বলতে পারি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সামগ্রিক জীবন পদ্ধতিই সুন্নাত। যে কাজ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে করেছেন তা সেভাবেই করা তাঁর সুন্নাত। যা তিনি করেননি, অর্থাৎ বর্জন করেছেন তা না করা বা বর্জন করাই সুন্নাত। কোনো কর্ম পালন বা বর্জনের ক্ষেত্রে গুরুত্ব, পদ্ধতি, ক্ষেত্র, সময়, স্থান ইত্যাদি যে কোনো বিষয়ে সুন্নাতের বেশি বা কম হলে বা সুন্নাতের বাইরে গেলে তা খেলাফে সুন্নাত হবে। তিনি যা করেননি বা খেলাফে সুন্নাত, কর্ম কখনোই দ্বীনের অংশ বা ইবাদতের অংশ হতে পারে না। তবে জাগতিক কর্ম হিসাবে বা ইবাদতের উপকরণ হিসাবে শরিয়তের বিধানের আলোকে তা জায়েয বা নাজায়েয হতে পারে।

সুন্নাতের বাইরে কোনো ইবাদত কবুল হবে না

কোরআন-হাদিসের অগণিত নির্দেশনা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, আল্লাহর দরবারে যে কোনো ইবাদত কবুল হওয়ার অন্যতম শর্ত হলো যে, সেই ইবাদতটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাত বা রীতি অনুসারে পালিত হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে কেবলমাত্র ইবাদতের নির্দেশই দেননি, উপরন্তু প্রতিটি ইবাদত নিজে পালন করে ইবাদতটি পালনের বিশুদ্ধ পদ্ধতিও তিনি আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন। প্রতিটি ইবাদত তাঁর পদ্ধতি বা সুন্নাত অনুসারে আদায় করা অত্যাবশ্যকীয়। সুন্নাতের ব্যতিক্রম কোনো কর্ম বা পদ্ধতি আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। কোনো ইবাদত যদি তাঁর পদ্ধতির বাইরে কোনোভাবে পালিত হয় তাহলে তো আল্লাহর নিকট কবুল হবে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

আমাদের কর্ম যা নয় এমন কোনো কর্ম যদি কোনো মানুষ করে তাহলে তার কর্ম প্রত্যাখ্যাত হবে (কবুল হবে না)। (বুখারি ও মুসলিম)।

অন্য হাদিসে তিনি বলেন,

যে ব্যক্তি আমার সুন্নাত থেকে অন্যমনস্ক হলো বা আমার সুন্নাতকে অপছন্দ করলো তার সাথে আমার সম্পর্ক নেই। (বুখারি ও মুসলিম)।

দাওয়াতের কাজও সুন্নাত পদ্ধতিতে হতে হবে

তাহলে আমরা বুঝতে পারি যে, দাওয়াত, তাবলিগ বা দীন প্রতিষ্ঠার ইবাদত পালন করতে আমাদেরকে হুবহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অনুসরণ করতে হবে। দাওয়াত বা দীন প্রতিষ্ঠার ইবাদতও যদি তাঁর সুন্নাত বা পদ্ধতির বাইরে পালিত হয় তাহলে তা প্রত্যাখ্যাত হবে এবং কবুল হবে না।

কিন্তু প্রশ্ন হলো, তাহলে কি আমাদের সে যুগের মত উটের পিঠে চড়ে দাওয়াতের জন্য চলাচল করতে হবে? আমরা কি মটরগাড়ী, এরোপ্লেন ইত্যাদিতে দাওয়াতের জন্য চলাচল করতে পারব না? আমরা শুধু মুখে বা হাতে লিখেই দাওয়াতের কাজ করব? আমরা কি আধুনিক মুদ্রণ, মাইক, রেডিও ইত্যাদি ইলেকট্রিক বা ইলেকট্রনিক উপকরণাদি ব্যবহার করতে পারব না? তিনি দাওয়াতের জন্য কোনো কারিকোলাম, সিলেবাস, সুনির্দিষ্ট বই পুস্তক, কর্মসূচি, সময়, দিন, মাস, বৎসর, স্থান বা অন্য কোনো বিষয় নির্ধারণ করে দেননি। তাহলে কি আমরা দিন, সময় বা স্থান নির্ধারণ করে বা বই পুস্তক ইত্যাদি নির্ধারণ করে দাওয়াতের জন্য কোনো কারিকোলাম বা কর্মসূচী গ্রহণ করব না?

ইবাদত ও উপকরণের পার্থক্য

বিষয়গুলি বুঝার জন্য আমাদেরকে ইবাদত ও ইবাদতের উপকরণের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে হবে। আমি এহইয়াউস সুনান গ্রন্থের চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায়ে এ বিষয়ে যথাসাধ্য বিস্তারিত আলোচনার চেষ্টা করেছি। দাওয়াতে রত মুমিনকে আমি সবিনয়ে আনুরোধ করব বইটি পড়ার জন্য। এখানে আমরা সংক্ষেপে বলতে পারি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা করেননি বা নির্ধারণ করেননি তা কখনোই দ্বীনের আংশ বা সাওয়াবের উৎস নয়। তবে তা ইবাদত পালনের উপকরণ হতে পারে। ইবাদত পালনের ক্ষত্রে তিনি যে সকল উপকরণ বা পদ্ধতি ব্যবহার করেননি তা দু প্রকারের। প্রথম প্রকারের উপকরণ তাঁর যুগে বিদ্যমান ছিল বা সে যুগে তার জন্য সেগুলি ব্যবহার করা সম্ভব ছিল, কিন্তু তিনি তা ব্যবহার করেননি। এগুলি মুমিন ব্যবহার করেন না; কারণ তিনি উচ্ছাপূর্বক তা বর্জন করেছেন। অন্য প্রকারের উপকরণ যেগুলি তাঁর যুগে ছিল না, পরবর্তীযুগে উদ্ভাবিত হয়েছে। ইসলামের অন্যান্য বিধিবিধানের আলোকে মুমিন ইবাদত পালনের উপকরণ হিসাবে প্রয়োজনে এ ধরণের উপকরণ ব্যবহার করতে পারেন। কিন্তু কখনই এর ব্যবহারকে ইবাদত বা ইবাদতের অংশ

বলে মনে করতে পারেন না। সাওয়াব নির্ভর করবে মূল ইবাদত পালনের বিশুদ্ধতা, ব্যপকতা ও গভীরতার উপরে। এ সকল উপকরণের সাথে সাওয়াবের সামান্যতম সম্পর্ক থাকবে না।

দাওয়াত বা দীন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে পদ্ধতি ও উপকরণের সুন্নাত ও খেলাফে সুন্নাত এবং এ বিষয়ক কিছু ভুলভ্রান্তি এখানে আলোচনা করতে চাই।

দাওয়াতের মাসনুন পদ্ধতি ও উপকরণ

আদেশ, নিষেধ, দীন প্রতিষ্ঠা বা দাওয়াতের যে সকল উপকরণ ও পদ্ধতি কোরআন-হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যবহার করেছেন সে সকল মাসনুন বা সুন্নাত সম্মত উপকরণের অন্যতম হল ১. কোরআন ২. হাদিস, ৩. হিকমাহ বা প্রজ্ঞা, ৪. সুন্দর ওয়াজ-উপদেশ, ৫. উৎকৃষ্টতর পদ্ধতিতে আলোচনা-বিতর্ক, ৬. জিহাদ ও কিতাল, ৭. অনুকরণীয় আদর্শ প্রতিষ্ঠা, ৮. উৎসাহ, পুরুস্কার ও শাস্তি।

- **কোরআন মাজিদ**
  কুরআনুল কারীম ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দাওয়াতের প্রধান ও মূল উপকরণ। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কোরআন কারীমে তাঁকে কোরআন পাঠ করে দাওয়াত প্রদানের নির্দেশ দিয়েছেন। কাফিরগণকে দ্বীনের দাওয়াত দিতে এবং মুমিনগণকে দ্বীনের দাওয়াত দিতে উভয় ক্ষেত্রে তিনি নিজে সদা সর্বদা কোরআন পাঠ করে দাওয়াত প্রদানকেই সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করতেন।
- **হিকমাহ ও হাদিস**
  কোরআন কারীমে বারংবার বলা হয়েছে যে, মহান আল্লাহ তাঁর মহান রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কুরআনের পাশাপাশি হিকমত বা প্রজ্ঞা দান করেছেন এবং তিনি তাঁর উম্মতকে কোরআনের পাশাপাশি প্রজ্ঞার মাধ্যমে দাওয়াত ও দ্বীন প্রতিষ্ঠা করেন। (বাকারা : ১২৯, ১৫১, ২৩১, ২৫১, আলে ইমরান: ১৬৪, নিসা : ১১৩, আহযাব : ৩৪, জুমুআহ : ২)
  রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রদত্ত হিকমত বা প্রজ্ঞা বা তাঁর আজীবনের শিক্ষা হাদিস হিসেবে সংকলিত ও সংরক্ষিত হয়েছে।
- **সুন্দর ওয়াজ**
  সুন্দর ওয়াজ ছিল রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দাওয়াতের অন্যতম উপকরণ। কোরআনে তাঁকে ওয়াজের মাধ্যমে দাওয়াত দেওয়ার জন্য বারংবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। (সূরা নিসা : ৪, সূরা নাহল : ১২৫)।
  কোরআনকেও বারংবার ওয়াজ হিসাবে অভিহিত করা হয়েছে (সূরা বাকারা : ২৭৫, সূরা

ইউনুস : ৫৭)।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওয়াজের ক্ষেত্রে লক্ষণীয় যে, তাঁর ওয়াজ ছিল মূলত: কোরআন নির্ভর। বিভিন্ন হাদিস থেকে আমরা দেখতে পাই যে, তিনি বক্তৃতা, ওয়াজ, খুতবা ইত্যাদি সব কিছুতেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোরআন পাঠ করতেন। এগুলির পাশাপাশি কিছু হিকমাহ বা উপদেশ প্রদান করতেন যা হাদিসরূপে সংকলিত। তাঁর ওয়াজের ক্ষেত্রে স্পষ্টতা, আন্তরিকতা, কৃত্রিমতাহীন, সরলতা, সংক্ষেপন ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়।

- **উৎকৃষ্টতর পদ্ধতিতে আলোচনা বিতর্ক**

  উৎকৃষ্টতর পদ্ধতিতে আলোচনা বিতর্ক উপস্থাপনের ক্ষেত্রে কোরআন অনন্য গ্রন্থ। ইহুদি, খৃস্টান, পৌত্তলিক বিভিন্ন অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের বিশ্বাস, কর্ম, আচার ইত্যাদির অসারতা, ভিত্তিহীনতা এবং ইসলামি বিশ্বাস ও কর্মের যৌক্তিকতা, প্রয়োজনীয়তা ও কল্যাণ অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী, সরল ও আকার্ষণীয়ভাবে তুলে ধরা হয়েছে। এক্ষেত্রে মূলনীতিই হলো প্রতিপক্ষের পদ্ধতির চেয়ে দায়ীর পদ্ধতি উৎকৃষ্টতর হতে হবে। ভাষা, ভাব, বিনম্রতা, বন্ধুভাবাপন্নতা, আন্তরিকতা, উপস্থাপনা সকল দিক থেকেই তা হবে উৎকৃষ্টতর। প্রতিপক্ষের সম্মান প্রদান, তার ভাল গুণাবলীর প্রশংসা, ব্যক্তিগত আক্রমণ বর্জন, ঢালাও অভিযোগ বর্জন ইত্যাদি কোরআনী বিতর্ক আলোচনার বৈশিষ্ট্য। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আজীবন এই পদ্ধতির অনুসরণ করেছেন।

- **জিহাদ ও কিতাল**

  দাওয়াতের একটি কোরআন-সুন্নাহ নির্দেশিত পদ্ধতি ও উপকরণ হলো জিহাদ ও কিতাল। জিহাদ অর্থ শ্রম, কষ্ট, চেষ্টা ইত্যাদি। কিতাল অর্থ যুদ্ধ। তবে ইসলামি পরিভাষায় সাধারণভাবে জিহাদ বলতে কিতাল বা যুদ্ধ বুঝানো হয়। এছাড়া দাওয়াতের কর্মকেও জিহাদ ও সর্বত্তোম জিহাদ বলা হয়েছে।

  কোরআন হাদিস থেকে আমরা জানতে পারি যে, কিতাল বা যুদ্ধ রাষ্ট্রীয় ফরজ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যম ছিল দাওয়াত। জিহাদ-কিতাল রাষ্ট্রের সংরক্ষণ ও নিরাপত্তার মাধ্যম। দাওয়াতের মাধ্যমে মদিনায় ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আগে আল্লাহ যুদ্ধ পর্যায়ের জিহাদ বৈধ করেননি। কোরআন ও হাদিসে জিহাদ বৈধ হওয়ার যে সকল শর্ত উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলির অন্যতম হলো: (১) রাষ্ট্রের অস্তিত্ব, (২) রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়া, (৩) রাষ্ট্রপ্রধানের নির্দেশ, (৪) কেবলমাত্র সশস্ত্র যোদ্ধাদের সাথে যুদ্ধ করা। ইসলামের নামে জঙ্গিবাদ বইয়ে আমি এ বিষয়ক আয়াত ও হাদিসগুলি আলোচনা করেছি।

- **নিজ আচরণের মাধ্যমে উত্তম আদর্শ স্থাপন**

  রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাওয়াতের অন্যতম উপকরণ ছিল নিজের জীবনে আদর্শের সর্বোত্তম বাস্তবায়নের মাধ্যমে উসওয়া হাসানাহ বা অনুকরণীয় আদর্শ স্থাপন করা। ইবাদত, বন্দেগী, আল্লাহ-ভীতি, মানব কল্যাণ, সৃষ্টির সেবা, সততা, বিশ্বস্ততা,

সাহসিকতা ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রেই তিনি ছিলেন সর্বোত্তম আদর্শ। দাওয়াতের সফলতার এ হলো প্রধান উপায়।

- **উৎসাহ, পুরস্কার ও শাস্তি**
  রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাওয়াতের অন্যতম প্রধান দিক ছিল উৎসাহ, পুরস্কার ও শাস্তি। তিনি প্রশংসনীয় কর্মে লিপ্ত মানুষদেরকে সুন্দর উপাধি, প্রশংসা, সম্মান, পুরস্কার ইত্যাদির মাধ্যমে উৎসাহিত করেছেন। অপরদিকে অন্যায়ে লিপ্ত মানুষদের শাস্তি প্রদান, কর্মের নিন্দা ইত্যাদির মাধ্যমে নিরুৎসাহিত করেছেন। সমাজে সৎ ও কল্যাণমুখি মানুষেরা যদি তাদের মূল্যায়ন না পান বা সততার কারণে তাঁরা যদি বঞ্চিত ও অবহেলিত হন এবং অসৎ মানুষেরা গলাবাজি বা অসততার মাধ্যমে পুরস্কৃত হন তাহলে আমাদের মুখের কথা সমাজে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে পারবে না। মুখের আদেশ নিষেধ ও দাওয়াতের ন্যায় এ ধরনের প্রশংসা, সম্মান বা উৎসাহও দাওয়াতের অন্যতম মাসনূন পদ্ধতি। প্রত্যেককেই নিজের ক্ষমতা ও দায়িত্ব অনুসারে এ দিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। দাওয়াতের জন্য এগুলি অন্যতম মাসনুন বা সুন্নাত সম্মত উপকরণ। দাওয়াত-রত মুমিনের দায়িত্ব হলো যথাসম্ভব মাসনূন উপকরণের সুন্নাত সম্মত ব্যবহারের মাধ্যমে দাওয়াতের ইবাদত পালন করা।

মাসনূন উপকরণের নিষিদ্ধ ব্যবহার

উল্লেখ্য যে, দাওয়াতের ক্ষেত্রে উপরের মাসনূন উপকরণগুলি অনেক সময় ইসলাম নিষিদ্ধ পদ্ধতিতে ব্যবহার করা হয়। আবেগ বা অজ্ঞতার ফলে দায়ী হয়ত ভাবেন যে, তিনি ইবাদত করছেন বা সাওয়াবের কাজ করছেন। অথচ তিনি মূলত পাপে লিপ্ত রয়েছেন।

ওহী-বহির্ভূত কথাকে ওহীর নামে চালনো

আমরা দেখেছি যে, ইসলামি দাওয়াত মূলত ওহী নির্ভর। আর এক্ষেত্রে ভয়ঙ্করতম অন্যায় হলো ওহীর নামে, অর্থাৎ আল্লাহ বা তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামে মিথ্যা বলা। মিথ্যা সর্বাবস্থাতেই কঠিন পাপ। আর ওহীর নামে মিথ্যা ভয়ঙ্করতম পাপ। দাওয়াতে রত মুমিন বিভিন্নভাবে এ কঠিন পাপে লিপ্ত হতে পারেন:

ওহীর নামে মিথ্যা বলা

মানবীয় কথাকে ওহীর নামে চালানোর প্রধান পদ্ধতি হলো আল্লাহ বা তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা বলেননি তা তাদের নামে বলা বা তাঁদের নামে কথিত মিথ্যা বা সন্দেহজনক কথা প্রচার করা।

দাওয়াত যেহেতু ওহী নির্ভর সেহেতু দাওয়াতরত ব্যক্তি চান যে, তার দাওয়াতের পক্ষে ওহীর বাণী শুনাবেন। ওহীর কোনো বাণী না পেলে কেউ কেউ শয়তানের প্ররোচনায় মনগড়া বানোয়াট কথাকে আল্লাহ বা তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা বলে প্রচার করেন। ইসলামের প্রথম যুগ থেকে মিথ্যা ও বানোয়াট হাদিসের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে, মানুষদেরকে ভাল পথে ডাকা ও খারাপ থেকে বিরত রাখার উদ্দেশ্যেই অধিকাংশ জাল হাদিস তৈরী ও প্রচার করা হয়েছে। বিভিন্ন নেক কাজের ফজিলত ও বিভিন্ন পাপের শাস্তির বর্ণনায় অগণিত বানোয়াট কথা জালিয়াতি করে হাদিস বলে চালানোর চেষ্টা করা হয়েছে, মুহাদ্দিসগণ তুলনামূলক নিরীক্ষার মাধ্যমে যে সকল জালিয়াতি উদঘাটন ও চিহ্নিত করেছেন।

শয়তান এ সকল জালিয়াতকে বুঝিয়েছে যে, ভাল পথে ডাকার জন্য কোরআন ও সহিহ হাদিস যথেষ্ট নয়। কাজেই ভাল উদ্দেশ্যে তুমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামে মিথ্যা বলতে পার। বর্তমান যুগেও দাওয়াতের ক্ষেত্রে মিথ্যা, অনির্ভরযোগ্য ও দুর্বল হাদিসের ছড়াছড়ি অত্যন্ত বেদনার সাথে লক্ষণীয়। কোন হাদিসে কত বেশি ফজিলত, সাওয়াব বা শাস্তির কথা বলা আছে, অথবা কোন হাদিসে কত আকর্ষণীয় গল্প আছে সেটাই শুধু লক্ষ্য করেন অনেক দায়ী। কোন হাদিসের সনদ কতটুকু শক্তিশালী তা বিবেচনা করতে তারা আগ্রহী নন। এঁরা হয়ত ভাবেন, শুধু কোরআনের আয়াত ও সহিহ হাদিস দিয়ে বোধহয় মানুষকে আকৃষ্ট করা সম্ভব নয়! আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন। যুগে যুগে এ প্রবণতা পূর্ববর্তী উম্মতদেরকে ধ্বংস করেছে। কোরআন ও হাদিসে অত্যন্ত কঠিনভাবে এ প্রবণতাকে নিষেধ করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন:

আল্লাহর নামে বা আল্লাহর সম্পর্কে যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা বলে তার চেয়ে বড় জালিম আর কে? (আনআম: ২১, ৯৩, ১৪৪, আরাফ: ৩৭, ইউনুস : ১৭, হূদ : ১৮, আল কাহফ : ১৫, আনকাবুত : ৬৮, সাফফ : ৭)

কোরআন কারীমে একাধিক স্থানে না জেনে, আন্দাজে বা অনুমান নির্ভর করে আল্লাহ, আল্লাহর দীন, বিধান ইত্যাদি সম্পর্কে কোনো কথা বলতে নিষেধ করা হয়েছে। সূরা আরাফের ৩৩ আয়াতে এরশাদ করা হয়েছে:

বল, আমার প্রতিপালক নিষিদ্ধ করেছেন প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীলতা আর পাপ এবং অসংগত বিরোধিতা এবং কোনো কিছুকে আল্লাহর শরিক করা যার কোন সনদ তিনি প্রেরণ করেননি, এবং আল্লাহর সম্বন্ধে এমন কিছু বলা যে সম্বন্ধে তোমাদের কোনো জ্ঞান নেই।

সূরা বাকারার ১৬৮-১৬৯ আয়াতেও অনুরূপ এরশাদ করা হয়েছে।
আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

তোমরা আমার নামে মিথ্যা বলবে না; কারণ যে ব্যক্তি আমার নামে মিথ্যা বলবে তাকে জাহান্নামে যেতে হবে। (বুখারি ও মুসলিম)।

সালামাহ ইবনুল আকওয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

আমি যা বলিনি তা যে আমার নামে বলবে তার আবাসস্থল হবে জাহান্নাম। (সহিহ বুখারি)

আশারায়ে মুবাশশারাহ-সহ প্রায় ১০০ জন সাহাবি এ অর্থে বিভিন্ন হাদিস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, সকল হাদিসের অর্থ একই, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা বলেননি তার নামে ইচ্ছায়, অনিচ্ছায় বা আন্দাজ অনুমান করে বলা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ এবং এর শাস্তি জাহান্নাম।

কোনো হাদিসের নির্ভুলতার বিষয়ে সন্দেহ হলে তা হাদিস হিসেবে গ্রহণ করাও নিষিদ্ধ। যদি কেউ যাচাই না করে যা শুনে তাই হাদিস বলে গ্রহণ করে ও বর্ণনা করে তাহলে হাদিস যাচাইয়ে তার অবহেলার জন্য সে হাদিসের নামে মিথ্যা বলার পাপে পাপী হবে। উপরন্ত, যদি কোনো হাদিসের নির্ভুলতা সম্পর্কে সন্দেহ থাকা সত্ত্বেও কোনো ব্যক্তি সে হাদিস বর্ণনা করে তাহলে সেও মিথ্যা হাদিস বলার পাপে পাপী হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

একজন মানুষের পাপী হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা শুনবে তাই বর্ণনা করবে। (সহিহ মুসলিম)

অন্য হাদিসে তিনি বলেন,

যে ব্যক্তি আমার নামে কোনো হাদিস বলবে এবং তার মনে সন্দেহ হবে যে, হাদিসটি মিথ্যা হতে পারে, সেও একজন মিথ্যাবাদী। (সহিহ মুসলিম)

দাওয়াতে রত মুমিনগণকে এ বিষয়ে অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে। আমি যদি আজীবন একটি হাদিসও না বলি বা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামে কিছুই না বলি তাহলে হয়ত আমার কোনো গোনাহ হবে না। কিন্তু আমি দাওয়াতের কাজ করতে যেয়ে যদি কোনো মিথ্যা বা সন্দেহজনক হাদিস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নামে বলে ফেলি তাহলে হয়ত আমাকে মিথ্যাবাদীরূপে কিয়ামতের দিন উঠতে হতে পারে। এর চেয়ে লাঞ্ছনা আর কি হতে পারে!

অনেক দায়ী যা শুনেন বা পড়েন তাই হাদিসরূপে বলেন। আমরা দেখলাম যে, হাদিসের নামে মিথ্যাচারের জন্য এটাই যথেষ্ট। কোনো হাদিস গ্রন্থে হাদিস পড়লেও তার বিশুদ্ধতা সম্পর্কে নিশ্চত না হয়ে তা বলা উচিত নয়। বড়জোর বলা যায় যে, অমুক গ্রন্থে হাদিসটি আছে, এর সনদের বিষয় আমি ভাল জানি না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বা হাদিসে আছে এ কথাটি উচ্চারণের পূর্বে মুমিনের উচিত শতবার চিন্তা করা।

অধিকাংশ হাদিস গ্রন্থের সংকলকগণের উদ্দেশ্য ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামে কথিত বা প্রচারিত শুদ্ধ ও অশুদ্ধ সকল হাদিস সনদ সহকারে সংকলন করা, যেন মানুষেরা সনদের আলোকে তা বিচার করে গ্রহণ করতে পারে। কিছু সংখ্যক মুহাদ্দিস ঢালাও সংকলন না করে শুধুমাত্র বিশুদ্ধ হাদিস সংকলন করার চেষ্টা করেন। বুখারি ও মুসলিমের সকল হাদিস সহিহ বলে প্রমাণিত হয়েছে। তিরমিজি, আবু দাউদ ও নাসাঈ সংকলিত অধিকাংশ হাদিস সহিহ বা হাসান। তবে এগুলিতে অনেক দুর্বল হাদিসও রয়েছে, যেগুলির দুর্বলতার কথা সংকলকগণ নিজেরাই উল্লেখ করেছেন। অন্যান্য হাদিসগ্রন্থগুলিতে সহিহ, জয়ীফ, মাউযু সকল প্রকারের হাদিস সংকলিত করা হয়েছে।
আমরা অনেক সময় ভাবি যে, অমুক বুজুর্গ হাদিসটি লিখেছেন, তিনি কি বিচার না করেই লিখেছেন?! এ চিন্তা ঠিক নয়। কোনো বুজুর্গ যদি তাঁর গ্রন্থে কোনো হাদিস লিখে হাদিসটি সহিহ বলে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন তাহলে তার রিফারেন্সে হাদিসটি বলা যেতে পারে। নইলে শুধুমাত্র কোনো গ্রন্থে আছে বলেই কোনো হাদিস বলবেন না। হাদিসটি কোন হাদিস গ্রন্থে সংকলিত এবং হাদিসটির সনদ সহিহ বা গ্রহণযোগ্য কিনা সে বিষয়ে মোটামুটি নিশ্চত না হওয়া পর্যন্ত কোনো হাদিস বর্ণনা না করাই মুমিনের জন্য নিরাপদ। কিয়ামতের দিন আল্লাহর দরবারে আমাদের প্রত্যেককেই নিজ কর্মের হিসাব নিজেই দিতে হবে।

ফজিলতের ক্ষেত্রে জয়িফ হাদিসের উপর আমল করা যায় বলে প্রচলিত একটি কথা আমাদেরকে অনেক সময় বিভ্রান্ত করে। জয়িফ হাদিসের উপর আমল করা আর জয়িফ হাদিসকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কথা বলে প্রচার করা এক নয়। অনেক আলেম কতকগুলি শর্ত সাপেক্ষ ফজিলতের ক্ষেত্রে জয়িফ হাদিসের উপর আমল করা জায়েয বলেছেন। শর্তগুলির মধ্যে রয়েছে:

- (১). জয়িফ হাদিসটি খুব বেশি জয়িফ বা দুর্বল হবে না।
- (২). জয়িফ হাদিসটিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কথা বলে মনে নিশ্চিত করা যাবে না। সাবধানতামূলকভাবে আমল করতে হবে। অর্থাৎ মনে করতে হবে, হাদিসটি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা হতেও পারে, কাজেই পারলে আমল করি।

অন্য অনেক আলেম জয়িফ হাদিসের উপর আমল করতে নিষেধ করেছেন। যেখানে অসংখ্য সহিহ হাদিসে নির্দেশিত কর্ম করার সময়ই অধিকাংশ মুসলিম পান না, সেখানে এ সকল জয়িফ হাদিস বিবেচনা করা ঠিক নয়। এছাড়া তারা বলেন যে, যারা জয়িফ হাদিসের উপর আমল করা জায়েয বলেছেন তাঁরা শর্ত করেছেন যে, বিশ্বাস বা আকিদাগত বিষয়ে কখনোই জয়িফ হাদিসের উপর নির্ভর করা যাবে না, শুধুমাত্র কর্মের ক্ষেত্রে সাবধানতামূলক কর্ম করা যাবে। কিন্তু বাস্তব অবস্থা হলো বিশ্বাস ও কর্ম বিচ্ছিন্ন করা মুশকিল। কারণ জয়িফ হাদিসের উপর আমল করছেন তিনি অন্তত বিশ্বাস করছেন যে, এই আমলের জন্য এই ধরণের সাওয়াব পাওয়া যেতে পারে। এজন্য এঁদের মতে জয়িফ হাদিস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কথা নয় বলেই বিবেচিত, তার পিছনে শ্রম ব্যয় অর্থহীন। সর্বাবস্থায় সকল আলিম ও মুসলিম উম্মাহ একমত যে, মওযু বা বানোয়াট হাদিস বর্ণনা করা বা তার উপর আমল করা একেবারেই নিষিদ্ধ ও হারাম।

ব্যাখ্যাকে ওহীর সাথে সংযুক্ত করা

ওহীর নামে মিথ্যা বলার আর একটা পদ্ধতি হচ্ছে, আল্লাহ বা তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা বলেছেন তার তাফসির বা ব্যাখ্যাকে ওহীর অংশ বানিয়ে দেওয়া, যাতে শ্রোতা বা পাঠকের কাছে মনে হয়, ব্যাখ্যাও বোধহয় আল্লাহ বা তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা।

ওহী আল্লাহর বাণী। আর তাফসির বা ব্যাখ্যা মানুষের কথা। কোনো ব্যাখ্যাই ওহী নয়। কাজেই ব্যাখ্যাকে ওহী থেকে পৃথক রাখতে হবে। এছাড়া ওহীর ব্যাখ্যা অবশ্যই সুন্নাতের আলোকে করতে হবে। নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী করলে তা অপব্যাখ্যায় পরিণত হবে। দাওয়াতে রত অনেক মুমিন ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় এ অন্যায়ের মধ্যে নিপতিত হন। কোরআন হাদিসের বাণীগুলির তরজমা করার সময় আমরা আমাদের পদ্ধতির আলোকে এমনভাবে অনুবাদ করি যেন বাণীটি আমাদের পদ্ধতিই সমর্থন করছে। যেমন জিহাদ বা কিতাল ফী সাবিলিল্লাহ বিষয়ক আয়াতগুলি আমরা আমাদের পছন্দমত আত্মশুদ্ধির চেষ্টা, আন্দোলন বা দাওয়াত অর্থে অনুবাদ করি। আমাদের উচিত অনুবাদ ও ব্যাখ্যাকে সর্বদা পৃথক রাখা।

অনুবাদের ক্ষেত্রে সংযোজন বা বিয়োজন

ওহীর নামে মিথ্যা বলার তৃতীয় পদ্ধতি হলো, অনুবাদের ক্ষেত্রে শাব্দিক অনুবাদ না করে অনুবাদের সাথে নিজের মনমত কিছু সংযোগ করা বা কিছু বাদ দিয়ে অনুবাদ করা। যেমন আমরা বলি, কোরআনে আছে , আদম যখন গন্দম ফল ভক্ষণ করলেন.... এখানে গন্দম ফল কথাটি অতিরিক্ত যা কোরআনে বা হাদিসে কোথাও নেই। অনুরূপভাবে আমরা বলি, কোরআনে আছে, যখন জুলাইখা ইউসুফকে আ. বললেন.... (যুলাইখা) নামটি আমাদের কথা, কোরআনের কথা নয়। অনুবাদের সময় নিজের পছন্দ অনুযায়ী কিছু বাদ দেওয়াও একই পর্যায়ের অপরাধ।

আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী সর্বাবস্থায় আক্ষরিকভাবে উপস্থাপন করতে হবে। এরপর আমাদের ব্যাখ্যা, শিক্ষা ইত্যাদিকে পৃথকভাবে উপস্থাপিত করতে হবে।

দ্বীনের নামে অনুমান নির্ভর মতামত বা ফতওয়া দেওয়া

ওহীর নামে মিথ্যা বলার চতুর্থ পদ্ধতি হলো, আল্লাহ বা তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন কিনা সে বিষয়ে নিশ্চিত না হয়ে আন্দাজ-অনুমানের উপর কিছু বলা। অধিকাংশ সময় আমরা আন্দাজেই বলি, এ ঠিক নয়, এ ইসলামে থাকতে পারে না, এ জায়েয হতে পারে না ইত্যাদি। আমরা অনেক সময় এক দুইটি আয়াত বা হাদিসের উপর নির্ভর করেই বলে ফেলি, অমুক বিষয় হারাম, বা অমুক বিষয় ইসলামে নেই। এ বিষয়ে আমাদের সতর্ক হতে হবে। আমরা যতটুকু জানি ততটুকুই বলব নইলে বলব, এ বিষয়ে স্পষ্ট কিছু জানি না।

গল্প নির্ভর ওয়াজ

আমরা দেখেছি যে, দাওয়াতের একটি মাসনূন উপকরণ হলো ওয়াজ । ওয়াজ অবশ্যই কোরআন ও হাদিস নির্ভর হবে। ওয়াজের নামে মিথ্যা হাদিস, বানোয়াট গল্প বা পূরবর্তী যুগের বুজুর্গগণের নামে প্রচারিত অনির্ভরযোগ্য বা সনদবিহিন কাহিনী বলার অগণিত ক্ষতির একটি হলো, কোরআন, হাদিস, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবিগণ থেকে মুসলিম উম্মাহকে দূরে সরিয়ে দেওয়া।

ঝগড়া নির্ভর বিতর্ক

দাওয়াতের জন্য, বিভিন্ন দাওয়াত কেন্দ্রিক দলের মধ্যে বা দাওয়াত বিরোধীদের সাথে আলোচনা বা বিতর্কের নামে ঝগড়া, বহস, বিদ্বেষমূলক বির্তক, হিংসা বা ঘৃণা প্রচার ইত্যাদি কঠিন হারাম কর্ম যেন

না ঘটতে পারে সে দিকে দাওয়াতরত মানুষদের সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। এখানে কয়েকটি বিষয় গুরুত্বের সাথে মনে রাখতে হবে।

- প্রথমত, সূরা আনকাবুতের ৪৬ আয়াতে আল্লাহ আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, আহলে কিতাব বা ইহুদি-নাসরাদের সাথেও উত্তম ভাবে ছাড়া বিতর্ক না করতে। তাহলে মুসলিমদের সাথে বিতর্কের আদব কেমন হতে পারে?
- দ্বিতীয়ত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন হাদিসে বারংবার বিতর্ক পরিত্যাগ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। এ গ্রন্থেও আমরা এ অর্থে একাধিক হাদিস দেখেছি। যে ব্যক্তি নিজের মত সঠিক জেনেও বিতর্ক পরিত্যাগ করবে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে বাড়ি বানিয়ে রাখবেন বলে তিনি বলেছেন। অন্যান্য হাদিসে দীন নিয়ে ঝগড়া বিতর্ক বিভ্রান্তির কারণ বলে তিনি জানিয়েছেন।
- তৃতীয়ত, বহস বা ঝগড়া মানুষের সত্য গ্রহণের পথে বড় বাধা। বিতর্কের ক্ষেত্রে উভয় পক্ষ একটি মত গ্রহণ করে সে পক্ষে বিতর্ক করেন। বিতর্কে হেরে গেলেও তারা তা মানতে চান না; কারণ বিষয়টি অহংবোধ ও মর্যাদার সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যায়। মুমিনদের দায়িত্ব হলো খোলা মনের আলোচনার মাধ্যমে সঠিক বিষয় জানার চেষ্টা করা। তা সম্ভব না হলে বিতর্ক এড়িয়ে নিজের কাজ করা ও ভিন্নমতাবলম্বিদের জন্য দোয়া করা আমাদের দায়িত্ব।

হিকমতের নামে অবৈধ কর্ম

হিকমত-এর নামে ইসলামে নিষিদ্ধ কোনো মাধ্যম ব্যবহার করা যায় না। কোনো মহৎ উদ্দেশ্যে কোনো পাপ, অন্যায় বা নিষিদ্ধ কর্ম করা ইসলামে বৈধ নয়। মিথ্যা বলা, মদপান করা, ধোঁকা দেওয়া ইত্যাদি নিষিদ্ধ কর্মকে হিকমত বলে দাওয়াতের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার বৈধ নয়।

জিহাদ বা কিতালের নামে মারামারি বা হত্যা

জিহাদ-কিতালের নামে মারামারি বা হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত হওয়া বা আইন ও বিচার নিজেদের হাতে তুলে নেওয়া দাওয়াতের ক্ষেত্রে একটি মারাত্মক বিভ্রান্তি। কোরআন-হাদিসে যেমন বিভিন্ন ইবাদতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তেমনি ইবাদতের জন্য শর্তবলী উল্লেখ করা হয়েছে। অগণিত স্থানে নামাজের নির্দেশ দেওয়ার পশাপাশি দু-একটি স্থানে কিবলা, পবিত্রতা, সতর, সময়, নিয়ত ইত্যাদি শর্তের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কেউ যদি এ সকল শর্ত অবজ্ঞা করে ইচ্ছামত নামাজ পড়তে থাকেন তাহলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না।
জিহাদ কিতালের ক্ষেত্রেও তেমনি অগণিত স্থানে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। পাশাপাশি কোথাও কোথাও জিহাদের জন্য রাষ্ট্র, রাষ্ট্র প্রধান, রাষ্ট্রীয় ঘোষণা, সন্ধি, আত্মসমর্পণ বা জিযিয়ার সুযোগ

প্রদান ইত্যাদি শর্তের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এ সকল শর্তের বাইরে জিহাদ করলে তা ইবাদত হবে না, বরং ইসলাম বিরোধী কর্ম বলে গণ্য হবে।
রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণের বাইরে ব্যক্তিগতভাবে বা গোষ্ঠীগতভাবে কারো বিরুদ্ধে মারামারি, খুনাখুনি, বিচার বা শাস্তি কখনোই জিহাদ নয়। এগুলি ইসলাম নিষিদ্ধ ফাসাদ, ফিতনা, সন্ত্রাস, হত্যা ও মানুষের ক্ষতি ছাড়া কিছুই নয়। কাজেই অমুক ব্যক্তি ইসলামের বিরোধিতা করছে, দাওয়াতের বিরোধিতা করছে বা ইসলাম বিরোধী কথা বলেছে কাজেই সে ইসলামের শত্রু এবং তাকে শাস্তি দিতে হবে বা তার বিরুদ্ধে জিহাদের বিধান প্রয়োগ করতে হবে এই আবেগপ্রসূত চিন্তা মুমিনকে বিভ্রান্তি ও সার্বিক ধ্বংসের মধ্যে নিপতিত করবে। এ বিষয়ে ইসলামের নামে জঙ্গিবাদ গ্রন্থটি পড়তে পাঠককে অনুরোধ করছি।

মিডিয়া, মিছিল, হরতাল ইত্যাদি আধুনিক উপকরণ

দাওয়াতের জন্য যে সকল আধুনিক উপকরণ ব্যবহার করা হয় বা করা যায় সেগুলির অন্যতম হলো কোরআন সুন্নাহ, ওয়াজ, ন্যায়ের উৎসাহ, অন্যায়ের আপত্তি ইত্যাদির জন্য পত্র-পত্রিকা, রেডিও, টেলিভিশন, ওয়েবসাইট ও অন্যান্য আধুনিক উপকরণ ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া ব্যবহার এবং মিছিল, হরতাল, ধর্মঘাট, মানববন্ধন, নির্বাচন ইত্যাদি উপকরণ ব্যবহার করা।

আধুনিক উপকরণ ব্যবহারের শর্তাবলী

এ সকল উপকরণের ক্ষেত্রে নিম্নের বিষয়গুলি লক্ষণীয়:

- প্রথমত, এ উপকলণগুলি ইসলামের বিধি-বিধানের পরিপন্থী না হলে তা প্রয়োজন ও সুযোগমত ব্যবহার করা যাবে। তবে সেগুলিকে কখনোই দ্বীনের বা ইবাদতের অংশ মনে করা যাবে না। কেউ সেগুলি ব্যবহার না করলে তাকে নিন্দা করা বা তার দাওয়াতের ইবাদত পালনে ত্রুটি হচ্ছে বলে মনে করার অবকাশ নেই।
- দ্বিতীয়ত, প্রয়োজন অনুসারেই তা ব্যবহার করতে হবে। এ সকল উপকরণের ব্যবহারে অমুসলিম সম্প্রদায়ের অন্ধ অনুকরণ অবশ্যই বর্জনীয়।
- তৃতীয়ত, এ সকল উপকরণের ব্যবহারের ক্ষেত্রেও ইসলামি আখলাকের পূর্ণ উপস্থিতি আবশ্যকীয়। আন্তরিকতা, ভালবাসা, বিনম্রতা, বন্ধুভাবপন্নতা, উৎকৃষ্ট দিয়ে মন্দ প্রতিরোধ ইত্যাদি বিষয় সকল অবস্থায় পালনীয়। গীবত, ঢালাও অভিযোগ ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রেই বর্জনীয়। অনেক সময় আমরা ওয়াজ, দাওয়াত, তাফসির, খুতবা ইত্যাদির সময় ইসলামি আখলাকের অনুসরণ করি। পক্ষান্তরে নির্বাচন, জনসভা, মিছিল ইত্যদির সময়ে পাশ্চাত্য রীতির অনুসরণ করি। এগুলিতে আমরা কাফির-ফাসিকদের মত জ্বালাও পোড়াও, ভেঙ্গে ফেল, গুড়িয়ে দাও ইত্যাদি ভাষা ব্যবহার, চিৎকার, লাফালাফি, গালাগালি, হাতে তালি

ইত্যাদি ইসলাম নিষিদ্ধ কর্ম করে থাকি। মনে হয় এগুলিতে ইসলাম পালনের প্রয়োজন নেই বা এগুলি ইসলামি কায়দায় করা যায় না। কাফির-ফাসিকদের ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ও মুমিনের দাওয়াত ও দ্বীন প্রতিষ্ঠা কখনোই একই আখলাকের হতে পারে না।

হরতাল, ধর্মঘট, অবরোধ, কুশপুত্তলিকা

আধুনিক উপকরণগুলি অবশ্যই ইসলামি বিধি-বিধানের আওতায় ব্যবহার করতে হবে। দাওয়াত, আদেশ, নিষেধ বা প্রতিবাদের নামে ইসলাম নিষিদ্ধ কোনো কাজ করা যায় না। হরতাল, ধর্মঘট, অবরোধ এ জাতীয় একটি আধুনিক উপকরণ, যা পাশ্চাত্য জগত থেকে আমাদের মধ্যে প্রবেশ করেছে এবং অনেক সময় পাশ্চাত্যের অনুকরণে ইসলাম বিরোধীভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

যদি কোনো সমাজে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে নাগরিকদের মতামত প্রকাশের জন্য মিছিল, হরতাল ইত্যাদির প্রচলন ও স্বীকৃতি থাকে তাহলে সে সমাজের দায়ীগণ দাওয়াতের বা আদেশ নিষেধের জন্য হয়ত তা ব্যবহার করতে পারেন, তবে তা অবশ্যই স্বতস্ফূর্ত ও ঐচ্ছিক হলে। হরতাল, ধর্মঘট, অবরোধ, প্রতিবাদসভা ইত্যাদির নামে রাস্তাঘাট বন্ধ করা, কাউকে কষ্ট দেওয়া, জোরপূর্বক অংশগ্রহণ করানো, জানমালের ক্ষতি করা, কর্মস্থলের অধিকার নষ্ট করা ইত্যাদি সবই কঠিন হারাম কর্ম। অনুরূপভাবে মুর্তি, কুশপুত্তলিকা বা কার্টুনমুর্তি তৈরী করা, ফাঁসি দেওয়া, পোড়ানো ইত্যাদিও ইসলাম নিষিদ্ধ কর্ম। এগুলি পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ ছাড়া কিছুই নয়। পাশ্চাত্য রীতি অনুসারে হরতালের সময় কর্মচারী ও কর্মকর্তাগণ কাজ বন্ধ করে দেন। ইসলামের নির্দেশে কর্মচারী বা কর্মকর্তার সাথে চুক্তি মোতাবেক পরিপূর্ণ সময় কর্ম করতে বাধ্য। তিনি তাঁর চুক্তি বাতিল করতে পারেন, কিন্তু চুক্তিবদ্ধ থাকা অবস্থায় চুক্তি ভঙ্গ করতে পারেন না। তাহলে জুলুম ও মানুষের হক নষ্ট করার পাপে পতিত হবেন। তিনি তার কর্মদাতার অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে পারেন। কিন্তু পাপের মাধ্যমে নয়। কর্মদাতার অন্যায়ের ক্ষেত্রেও তিনি কর্ম না করে টাকা নিতে পারেন না। আইনানুগ পদ্ধতিতে অন্যায়ের প্রতিকার করতে পারেন। তাহলে যেক্ষেত্রে কর্মদাতার কোনো অন্যায় নেই, রাষ্ট্রের বা অন্য কারো অন্যায়ের প্রতিবাদ তিনি চুক্তির খেলাফ করে কাজ না করে বসে থাকবেন কিভাবে?

এছাড়া এ জাতীয় কর্ম অনেক সময় উম্মতের জন্য ক্ষতিকর। আমেরিকা বা ইসরাইলের কোনো একটি অন্যায়ের প্রতিবাদে বাংলাদেশের মানুষ একদিন হরতাল-ধর্মঘট পালন করলে ইহুদিদের কোনো ক্ষতি হবে না। ক্ষতি হবে বাংলাদেশের, রাষ্ট্রের ও জনগণের। এরূপ কর্ম কখনোই শরিয়তে বৈধ হতে পারে না এবং কোনো অবস্থাতে ন্যায় প্রতিষ্ঠার বা অন্যায়ের প্রতিবাদের ইসলামি মাধ্যম হতে পারে না। বিশ্বের যে কোনো স্থানে মজলুম মানুষ ও প্রাণীর প্রতি সমবেদনা ও জুলুমের নিন্দা করা মুমিনের দায়িত্ব। তবে তা ইসলামি আখলাক ও পদ্ধতির আওতায় করতে হবে। গণমাধ্যমের ব্যবহার,

শান্তিপূর্ণ সমাবেশ, জালিমের কাছে প্রতিবাদ পাঠানো, মজলুমের সাহায্যে এগিয়ে যাওয়া ইত্যাদি অনেক পদ্ধতি রয়েছে যা ইসলাম সম্মত।

পাশ্চাত্য ষ্টাইলে জাগতিক ক্ষমতার দ্বন্দ্বে লিপ্ত মানুষেরা স্বভাবতই হালাল হারামের তোয়াক্কা করবে না। কিন্তু দাওয়াত ও দীন প্রতিষ্ঠার কর্মে লিপ্ত মুমিনকে অবশ্যই আল্লাহর নির্দেশ, বান্দার হক্ক ইত্যাদির বিষয় গুরুত্বের সাথে লক্ষ্য রাখতে হবে। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, আমাদের প্রতিটি কাজের জন্য একদিন আল্লাহর দরবারে চুলচেরা হিসাব দিতে হবে। এ দুনিয়ার সামাজিক জীবনে এ সকল হক্ক নষ্ট করা হয়ত আমরা খুবই হালকাভাবে দেখি, কারণ, কোনো অন্যায় সবত্র ঘটতে দেখলে তা গা সওয়া হয়ে যায়। কিন্তু আল্লাহর হিসাবে আমরা পার হতে পারব কি?

উপকরণ বনাম ইবাদত : বিভিন্ন ভুলভ্রান্তি

প্রাচীন যুগ থেকেই মুসলিম উম্মাহর মধ্যে দাওয়াত বা দীন প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব পালনের জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি, দল ও মতের সৃষ্টি হয়েছে। এগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কল্যাণকর ও প্রয়োজনীয়। প্রত্যেকেই কোরআন ও হাদিস থেকে নিজেদের কর্মের অনুপ্রেরণা গ্রহণ করেছেন। পাশাপাশি যুগ ও পরিবেশের চাহিদা মুতাবেক কিছু নতুন পদ্ধতি সংযোজন করেছেন। সাধারণভাবে এ সকল পদ্ধতি ইবাদত হিসেবে চালু করা হয়নি। ইবাদত পালনের সহায়ক উপকরণ হিসাবেই এগুলিকে চালু করা হয়েছে। কিন্তু কালের আবর্তনের সাথে সাথে এ সকল পদ্ধতির অনুসারীরা এসকল পদ্ধতিকে ইবাদতের অংশ বলে মনে করে বিভ্রান্তি ও দলাদলির মধ্যে নিপতিত হয়েছেন।

এ সকল নব উদ্ভাবিত দল বা পদ্ধতির ক্ষেত্রে দুইটি বিষয় লক্ষণীয়:

- প্রথমত, মাসনূন উপকরণগুলি প্রয়োজন অনুসারে খেলাফে সুন্নতভাবে সীমিত করা বা নির্ধারিত করা। যেমন কোরআন. হাদিস, ওয়াজ ইত্যাদির মাধ্যমে দাওয়াত প্রদানের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো সিলেবাস-পাঠ্যক্রম, সময়, স্থান বা পদ্ধতি নির্ধারণ করে দেননি। এ সকল উদ্ভাবিত পদ্ধতিতে প্রয়োজন অনুসারে তা নির্ধারিত করা হয়েছে। নির্ধারিত গ্রন্থাবলী পড়ার বা নির্ধারিত দিন, মাস বা বছর ধরে বা নির্ধারিত সময়ে বা স্থানে দাওয়াতি কর্ম করার ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- দ্বিতীয়ত, এগুলির মধ্যে প্রয়োজন অনুসারে খলাফে সুন্নত বা সুন্নত বহির্ভূত নতুন কিছু উপকরণ বা পদ্ধতি সংযুক্ত করা হয়েছে।

অনেক সময় এ প্রকারের সংযোজন বা নির্ধারণের জন্য কোরআন হাদিস থেকে অনুপ্রেরণা নেওয়া হয়। যেমন আল্লাহ রমজানে একমাস রোজা পালনের নির্দেশ দিয়েছেন, কাজেই আমরা আমাদের

দাওয়াতের কোর্স একমাস নির্ধারণ করেছি। এর মধ্যে বিশেষ বরকত পাওয়া যাবে। অথবা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দশ দিন ইতিকাফ করতেন, এজন্য আমরা আমাদের ওয়াজ মাহফিল দশদিন ব্যাপি করেছি। অথবা তিনি হিজরত করে চিরস্থায়ীভাবে মক্কা শরিফ ত্যাগ করে মদিনায় গমন করেছিলেন, এজন্য আমরা দাওয়াত, ওয়াজ বা দীন প্রতিষ্ঠার জন্য এক দেশের মানুষকে হিজরত করে অন্য দেশে স্থায়ী বসবাসের ব্যাবস্থা করি। অথবা তিনি হজ্জের সময় ইহরামের কাপড় পরিধান করতেন, এজন্য আমরা দায়ীদেরকে দাওয়াতের সময় ইহরামের কাপড় পরিধান করার ব্যবস্থা করেছি।

এ প্রকারের অনুপ্রেরণার ভাল দিক থাকলেও অনেক সময় বিদআত ও সুন্নত বিরোধিতার জন্ম দেয়। যেমন, নামাজ আদায়ের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়াতে নির্দেশ দিয়েছেন বা উৎসাহ দিয়েছেন। কিন্তু কোরআন তিলাওয়াতের জন্য তিনি এরূপ কোনো নির্দেশ বা উৎসাহ দেননি। তিলাওয়াতের ইবাদত তিনি উন্মুক্তভাবে পালন করেছেন। বসে বা দাঁড়িয়ে যে কোনো অবস্থায় তিলাওয়াত করলে সমান সাওয়াব পাওয়া যাবে। এখন যদি কেউ মনে করেন যে, নামাজের জন্য দাঁড়ানো ফরজ বা উত্তম অতএব তিলাওয়াতও দাঁড়িয়ে করা উত্তম বা দাঁড়িয়ে তিলাওয়াত করলে অতিরিক্ত সাওয়াব বা বরকত পাওয়া যাবে, তবে তিনি খেলাফে সুন্নত একটি কর্মকে ইবাদতের অংশ মনে করে বিদআত ও সুন্নাত বিরোধিতায় লিপ্ত হলেন।

আমি এহইয়াউস সুনান গ্রন্থে সুন্নত থেকে বিদআতে উত্তরণের বিভিন্ন কারণ ও পদ্ধতির আলোচনা করেছি। গ্রন্থটির পঞ্চম অধ্যায়ের পঞ্চম পদ্ধতির আলোচনায় উপকরণকে ইবাদত মনে করার বিভিন্ন প্রবণতা বিস্তারিত আলোচনা করেছি। আমি পাঠককে আবারো সবিনয় অনুরোধ করছি বইটি পড়তে। এখানে শুধুমাত্র একটি বিষয়ের প্রতি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বর্তমান সময়ে অনেক নেককার মুমিন দাওয়াতের কাজে রত রয়েছেন। সকলেরই উদ্দেশ্য আল্লাহর পথে দাওয়াতের মাধ্যমে সমাজের সর্বত্র ইসলামকে প্রতিপালিত ও প্রতিষ্ঠিত করা। এ সকল কাজের মধ্যে পার্থক্য:

- প্রথমত, নাম ও পরিভাষা ব্যবহারে। তাজকিয়া, আন্দোলন, ইকামতে দীন, তাবলীগ, জিহাদ, মাদ্রাসা, ওয়াজ ইত্যাদি বিভিন্ন নাম ব্যবহার করা হচ্ছে।
- দ্বিতীয়ত, দাওয়াতের বিষয়বস্তু নির্ধারণে। ঈমান-আকিদা , শিক্ষা, আত্মশুদ্ধি, ব্যক্তিগত কর্ম, সমাজ সেবা, রাজনৈতিক পরিবর্তন ইত্যাদি একেক দল একেক বিষয়কে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন।
- তৃতীয়ত, পদ্ধতিতে। বিভিন্ন দল বিভিন্ন পদ্ধতিতে কাজ করছেন। পদ্ধতিগুলি কোনোটিই হুবহু মাসনূন পদ্ধতি নয়।

এ সকল পদ্ধতিতে দাওয়াত ও দীন প্রতিষ্ঠায় রত অনেকেই এ সকল খেলাফে সুন্নাত বা সুন্নাত বহির্ভূত পদ্ধতি ও উপকরণকে মূল ইবাদত দাওয়াত এর অংশ মনে করছেন এবং বিভিন্ন বিভ্রান্তির মধ্যে নিপতিত হচ্ছন।

- প্রথমত, একে অন্যের দাওয়াতের ইবাদত পালিত হচ্ছে না বলে মনে করছেন। কেউ হয়ত ওয়াজ, গ্রন্থ রচনা, মাদ্রাসা ইত্যাদি মাধ্যমে দাওয়াতের দায়িত্ব পালন করছেন, কিন্তু অন্য পদ্ধতির দায়ী ভাবছেন, যেহেতু তিনি আমার পদ্ধতিতে কাজ করছেন না, সেহেতু তার দাওয়াতের ইবাদত পালিত হচ্ছে না।
- দ্বিতীয়ত, অনেক সময় একে অন্যের কোনো ইবাদতই হচ্ছে না বলে মনে করছেন। যেহেতু ঐ ব্যক্তির দাওয়াত বা দীন প্রতিষ্ঠা নামক ইবাদত পালিত হচ্ছে না, সেহেতু তার অন্য কোনো ফরজ, সুন্নাত ও নফল ইবাদত কবুল হচ্ছে না। কাজেই আমার পদ্ধতির বাইরে যারা রয়েছেন তাদের নামাজ, রোজা, হজ্জ, জিকির, তিলাওয়াত, তাহাজ্জুদ ইত্যাদি সবই মূল্যহীন বা অপূর্ণ।

এ সকল বিভ্রান্তির অন্যতম কারণ হলো নব উদ্ভাবিত খেলাফে সুন্নত উপকরণ বা পদ্ধতিকে মূল ইবাদতের অংশ মনে করা। আমাদের উচিত পদ্ধতির চেয়ে মূল ইবাদতের দিকে বেশি লক্ষ্য রাখা, নিজের ইবাদত কবুল হচ্ছে কিনা সেদিকে বেশি লক্ষ্য রাখা এবং সকল মুসলিম ও সকল দায়ীকে আল্লাহর ওয়াস্তে ভালবাসা।

সবচেয়ে দু:খজনক হলো এ সকল কারণে দলদলির জন্ম নেওয়া। কোরআন ও হাদিসে উম্মাহর মধ্যে ইফতিরাক বা দলাদলি কঠিনভাবে নিষেধ করা হয়েছে। কোরআন সুন্নাহর আলোকে ইসলামি আকিদা গ্রন্থে আমি এ বিষয়ক আয়াত ও হাদিস বিস্তারিত আলোচনা করেছি। ইসলামে মতভেদ থাকতে পারে কিন্তু দলভেদ থাকতে পারে না। বস্তুত আমাদের একটিই দল আছে, তার নাম ইসলাম। সকল মুসলিম আল্লাহর দল এবং সকল কাফির শয়তানের দল। শয়তানের দলকে মুমিন অন্য দল বলে মনে করেন। কোনো মুসলিমকে অন্য মুসলিম অন্য দল বলে মনে করতে পারেন না। পদ্ধতিগত বা মতামতগত পার্থক্যের কারণে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে দলাদলি ও বিভক্তি নি:সন্দেহে অত্যন্ত বেদনাদায়ক বিষয়।

শেষ কথা

সম্মানিত পাঠক, দাওয়াতের পূর্ণতা, কবুলিয়্যাত ও সফলতার জন্য দায়ী-মুবাল্লিগদের পারস্পরিক সম্প্রীতি, মহব্বত ও ঐক্য প্রয়োজন। মহান আল্লাহ আমাদেরকে দীন প্রতিষ্ঠা করতে এবং দলাদলি-মতভেদ না করতে নির্দেশ দিলেন। কিন্তু আমরা দলদলি মতভেদে লিপ্ত রয়েছি। আমরা সকলেই ঐক্যের কথা বলছি। কিন্তু ঐক্য হচ্ছে না কেন?

অনেক কারণ থাকতে পারে। একটি কারণ হলো, আমরা প্রত্যেকেই নিজের দায়িত্বের চেয়ে অন্যের

দায়িত্বের কথা বেশি চিন্তা করছি। প্রত্যেকেই মনে করছি, এ বিভক্তি বা বিচ্ছিন্নতার জন্য আমি বা আমার দল দায়ী নয়, বরং অমুক বা তমুক দায়ী। তবে প্রকৃত কথা হলো আমরা সকলেই কমবেশি অপরাধী। আমাদের প্রয়োজন, নিজের দায়িত্বের দিকে বেশি লক্ষ্য রাখা। অন্যেরা আমার বিরুদ্ধে যাই করুক, আমি সকল দায়ীকে ভালবাসব, সবাইকে আমার আন্দোলনের কর্মী ও আমার কাফেলার সাথী বলে মনে করব। সম্ভব হলে তাদের ভুলত্রুটি ভালবেসে সংশোধনের চেষ্টা করব। নইলে আল্লাহর কাছে তাদের সংশোধনের দোয়া করব। নিজের দায়িত্ব পালনে আমি সচেষ্ট থাকব।

ঐক্য বলতে সকল দায়ী একই মাদ্রাসায় পড়াবেন বা একই পদ্ধতিতে দাওয়াত দিবেন বলে আমরা আশা করতে পারি না। একই শহরে কোরআন শিক্ষার বিভিন্ন কারিকুলাম ও পদ্ধতির অনেকগুলি মাদ্রাসা থকতে পারে। সবারই উদ্দেশ্য কোরআন শিক্ষা। তবে পদ্ধতির ত্রুটি ও শিক্ষকদের আমলের ত্রুটি থাকতে পারে। তা সত্বেও সকলের মধ্যে মহব্বত ও একই কাফেলার সহযাত্রী-র অনুভূতি থাকা প্রয়োজন। সম্ভব হলে পরস্পরে ভুলত্রুটি ভালবেসে সংশোধন করার চেষ্টা করতে হবে। না হলে কোরআনের খাদেম হিসাবে ত্রুটিসহই ভালবাসতে হবে। না হলে প্রত্যেকে নিজের মত কাজ করতে হবে। কিন্তু যদি সকল মাদ্রাসার ছাত্র শিক্ষকগণ সর্বদা পরস্পরের পদ্ধতি ও কর্মের দোষত্রুটির সন্ধান, আবিস্কার ও প্রচারে ব্যস্ত থাকেন তাহলে কি কোরআনের খিদমত ভালভাবে হবে?

মহান আল্লাহ দয়া করে দাওয়াতের ময়দানে কর্মরত সকলের ভুলত্রুটি ক্ষমা করুন, তাঁদের প্রচেষ্টা কবুল করুন এবং সর্বোত্তম পুরুস্কার প্রদান করুন। দাওয়াত বিষয়ক এই ক্ষুদ্র আলোচনার এখানেই ইতি টানছি। এর মধ্যে যদি কোনো কল্যাণকর কিছু থাকে তবে তা আমার করুণাময় প্রতিপালক আল্লাহ জাল্লা জালালুহুর একান্ত দয়া। আর এর মধ্যে ভুলভ্রান্তি যা আছে তা সবই আমার নিজের দুর্বলতা ও শয়তানের প্রবঞ্চনার কারণে। আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। সকল প্রসংশাই তাঁর। সালাত ও সালাম তাঁর প্রিয়তম হাবিব ও খলিল মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পরিজন, সহচর ও অনুসারীগণের উপর।

সমাপ্ত